শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবন

নূর নাহার শারমিন সুলতানা*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) অবস্থান স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। মূলত রোমান্টিক উপন্যাস 'কাশবনের কন্যা'র সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি নিবিড় হলেও 'পথ জানা নাই'- এর মতো বাস্তবতাঘনিষ্ঠ গল্প রচনা করেও তিনি তাঁর শিল্পদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্প রচনায়ও তিনি উৎকীর্ণ করেছেন শৈল্পিক নৈপুণ্য। গ্রামীণ জনজীবন, বিশেষত দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষের সংগ্রামশীল জীবনবাস্তবতা, বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দাহ, হতাশা-বেদনা, নৈরাশ্য-যন্ত্রণার রূপচিত্রাঙ্কনে তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর। দক্ষিণ বাংলার ঝালকাঠি জেলার নদী-অধ্যুষিত এক গ্রামীণ জীবনপরিবেশে আজন্ম বেড়ে উঠেছেন তিনি। এ কারণে তাঁর সৃষ্টিকর্মে সেই জীবনেরই রয়েছে বিপুল উপস্থিতি। দীর্ঘসময় দেশ থেকে বহুদূরে অবস্থান করলেও তাঁর মনোলোক থেকে অতীতের সেই যাপিত জীবনকে তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি। ফলে মনের চেতন কিংবা অবচেতন স্তর থেকে উঠে আসা সেই জীবনই বারবার তাঁর সৃষ্টিকর্মে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।]

বাংলাদেশের জীবন ও সমাজ প্রধানত গ্রামনির্ভর। স্বাভাবিকভাবেই, বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম প্রধান উপজীব্য হচ্ছে গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন এবং এ জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ ও প্রসঙ্গ। তবে জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা এবং অভিজ্ঞতার তারতম্যের কারণে পল্লিজীবনকে সাহিত্যের আয়নায় প্রতিবিম্বিত করার ক্ষেত্রে স্বভাবতই বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি বেছে নিয়েছেন। "কেউ বাস্তবতার নিরাবেগ অবিকল উপস্থাপনা করেছেন, আবার কেউ অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করা সত্ত্বেও বাস্তবতাকে দেখেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিতে [...]" (আকিমুন, ১৯৯৩ : ২০৪)। গ্রামের মাটি ও মানুষের সাথে গভীর ও ব্যাপক সম্পর্ক না থাকলে গ্রামীণজীবনকে নিখুঁতভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা কঠিন। "শহরবাসী সাহিত্যকর্মীদের পক্ষে গ্রাম-জীবনের অন্তর্নিহিত চেহারা ও চরিত্রে অভিজ্ঞতার অভাব অস্বাভাবিক ঘটনা রূপেই প্রতিফলিত। যোগসূত্রের এই অভাবের ফলে অন্তঃশীলা গ্রামীণ জীবন-চিত্র গভীর অন্তরঙ্গতায় কিংবা বিশ্লেষী আলোর বর্ণচ্ছটায় শিল্পীর চেতনায় প্রতিফলিত হয় না" (ভুঁইয়া ইকবাল, ১৯৯৮ : ৫৪)। এ কারণে বাংলা সাহিত্যে গ্রামীণজীবননির্ভর বিশ্বাসযোগ্য ও কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম সেসব সাহিত্যিকের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়েছে, গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল ব্যাপক ও গভীর।

স্থান ও কালভেদে এদেশের গ্রামীণ জীবনে আছে বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা। এতৎসত্ত্বেও এমন কিছু অনুষঙ্গ আছে যা গ্রামজীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। "বাংলাদেশ চিরকালই ছিল কৃষিনির্ভর। কাজেই ভূমি-ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেই বাংলাদেশে গ্রামের পত্তন, শ্রেণীবিন্যাস এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক-অধিকারের বিকাশ ঘটেছে" (রওনক, ১৯৭২ : ১৯)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কৃষিকাজ ও কৃষিনির্ভর পেশা, সামাজিক আচার-আচরণ, সংস্কার ইত্যাদি হচ্ছে বাংলার গ্রামীণ জীবনের মৌলিক অনুষঙ্গ। এর পাশাপাশি উল্লেখ করা

*প্রভাষক, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, ঢাকা।

যায় উৎসব ও পালাপার্বণ, আতিথেয়তা, পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ—যা এদেশের গ্রামীণ জনপদের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। আবার অভাব-দারিদ্র্য, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ, ক্ষমতাবানদের শোষণ-নির্যাতন ইত্যাদির দৃষ্টান্তও বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যকে স্বীকরণ করে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা রচনা করেছেন তাদের কালজয়ী কথামালা; গ্রামীণ জীবন ও জনপদকে অবলম্বন করে সৃষ্টি করেছেন গল্প-উপন্যাস। শামসুদ্দীন আবুল কালাম এই ধারারই সার্থক উত্তরাধিকার; যাঁর কথাসাহিত্যের বিস্তীর্ণ পরিসরে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ জনাঞ্চলের বিচিত্র চলচ্ছবি।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলো হলো: *শাহেরবানু* (১৯৪৫), *পথ জানা নেই* (১৯৫৩), *ঢেউ* (১৯৫৩), *দুই হৃদয়ের তীর* (১৯৫৫), *অনেক দিনের আশা* (১৯৫৬), *জীবন-কাব্য* (১৯৫৬), *পুঁই ডালিমের কাব্য* (১৯৮৭), *মজা গাঙের গান* (১৯৮৭)। এসব গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলোতে এক ধরনের রোমান্টিক স্বপ্নময়তার আবেশে গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের জীবনের নানা অনুষঙ্গকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, তাঁর গল্পের ক্যানভাসে স্থাপন করেছেন গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি, পেশা ও জীবিকা, অভাব-দারিদ্র্য, শোষক শ্রেণির দৌরাত্ম্য, পারস্পরিক সোহার্দ্য-সম্প্রীতি, বিবাদ-বিসংবাদ, শ্রেণিবৈষম্য, লোকাচার-লোকসংস্কৃতি, লোকচিকিৎসা, লোককথা, নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, নিপীড়ন-নির্যাতন, সমকালীন রাজনৈতিক প্রভাব, নগরসভ্যতার দৌরাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পে এ বিষয়সমূহ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেটিই বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

জীবন ও প্রকৃতি

বাংলার বিচিত্র-সুন্দর প্রকৃতি তার সকল সৌন্দর্য ও সৌকর্য নিয়ে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করেছে এদেশের মানুষের জীবন ও মননকে। তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা; মানুষের জীবনে অনপনেয় ছাপ রেখে গেছে প্রকৃতির নানাবিধ পরিবর্তন। শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'মজা গাঙের গান' (*মজা গাঙের গান*) , 'নবমেঘভার' (*দুই হৃদয়ের তীর*), 'ভাঙন' (*শাহেরবানু*), 'জোর যার' *(শাহের বানু)*, 'বন্যা' (*পথ জানা নাই*), 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*), 'মৌসুম' (*অনেক দিনের আশা*), প্রভৃতি গল্পে গ্রীষ্মের খরতাপ, বর্ষায় বৃষ্টির ছন্দ, শরতের শান্ত-স্নিগ্ধ নদীতীর, হেমন্তে ধানকাটার উৎসব, শীতের হিম কুয়াশা কিংবা বসন্তের পুষ্পশোভিত দৃশ্যপট প্রভৃতি বিষয় যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট এসব মানুষের প্রকৃতিনির্ভরতা, প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠতা এমনকি প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা—সবকিছুই লেখক তুলে ধরেছেন গভীর পারঙ্গমতায়। 'মজা গাঙের গান' গল্পে গ্রীষ্মের খরতাপে চৌচির ধানক্ষেত, মন-কেমন-করা ঘুঘুর ডাক, আর রৌদ্রের খরতাপে 'উনুনের শূন্য আর তেতে ওঠা পাত্রের মত কম্পমান জগত'–এসব টুকরো টুকরো দৃশ্যের কোলাজ গ্রীষ্মের বিরূপ প্রকৃতিকে দৃশ্যমান করে তোলে। একইভাবে বর্ষাসিক্ত বাংলার অপরূপ চিত্রও অঙ্কন করেছেন গল্পকার। গ্রামবাংলার অবারিত সৌন্দর্য যে ঋতুতে মূর্ত হয়ে ওঠে তার নাম বর্ষা। দিনভর বৃষ্টির গানে, আকাশ কালো-করা মেঘের পদচারণায় কিংবা ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে নতুন এক রূপে সজ্জিত হয় বাংলার গ্রামগুলো। 'নবমেঘভার' গল্পে মাজু মিঞার স্মৃতিচারণে বর্ষণমুখর পল্লিপ্রকৃতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত মাজু মিঞার বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সাথে বর্ষার মেঘভার যেন একাকার হয়ে ধরা দিয়েছে এ গল্পে। তাই বর্ষণমুখর একটি দিনে মাজু মিঞা বিস্মরণের পর্দা ছিঁড়ে বারবার ফিরে যাচ্ছে শৈশবে। পানিতে ভেসে যাওয়া প্রান্তরে নাক উঁচু করে ব্যাঙের একটানা ডেকে যাওয়া কিংবা 'পানির মুকুরে নিজের ছায়া দেখা তৃণলতার' উল্লেখ-এ সবই গল্পকারের পর্যবেক্ষণ-দক্ষতার পরিচায়ক। বর্ষণমুখর দিনে অলস সময় পার করতে হয় গ্রামের মানুষদের। কর্মহীন সময়গুলো পার করার জন্য নানারকম বিনোদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মানুষ। বর্ষার কর্মহীন সময়গুলো গল্প-গুজব এবং সন্ধ্যায় পুঁথিপাঠের

আসর জমিয়ে পার করে। হেমন্তকালে গ্রামের মাঠে মাঠে শুরু হয় ফসল তোলার উৎসব। শরতের রোদ ঝলমল সকালগুলো কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়তে থাকে, প্রকৃতিতে ধ্বনিত হয় শীতের পদধ্বনি। সোনালি ধানের আহ্বানে আবর্তিত হয় কৃষকের সমস্ত চিন্তাচেতনা। নতুন ধান কেবল কৃষকের ক্ষুধাই মেটায় না, তার ভবিষ্যৎকে স্বপ্নময় ও রঙিন করে তোলে। হেমন্তের শেষে কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে হিমশীতল অনুভূতি ছড়িয়ে শীতের আগমন ঘটে। পল্লিবাংলায় শীতের আমেজই আলাদা। শীতকালে গ্রামের প্রতিটি ঘর নবান্ন উৎসবে রঙিন হয়ে ওঠে। নতুন ধানের তৈরি পিঠে পুলি এবং খেজুর রসের পায়েস (সিন্নি) খাওয়ার ধুম পড়ে যায় ঘরে ঘরে। 'ভাঙন' গল্পে দেখা যায়, খেজুর রসের সিন্নি খাওয়ার আনন্দ থেকে বাদ যাচ্ছে না গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলোও। এ গল্পের আনোয়ারের চুরি করে আনা খেজুরের রস, নারিকেল দিয়ে 'সিন্নি' রাঁধা এবং মধ্যরাতে পরিবারের সদস্যদের 'শীতে গুটিসুটি দিয়ে উনুন ঘিরে চাপাস্বরে গল্প, তারপর কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি করে খাওয়া'র মধ্যেও গ্রামীণ জীবনে এ ঋতুর আবেদন পরিস্ফূটিত হয়।

প্রকৃতির ঐশ্বর্যে পল্লিবাংলার মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হলেও প্রকৃতির বিরূপতা তাদের জন্য নিয়ে আসে চরম বিপর্যয়। 'বন্যা' গল্পে বন্যাকবলিত অসহায় গ্রামবাসীর নিয়তিনির্ভরতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে গ্রাম, মাঠ, জমির আল এমনকি নদী পারাপারের সাঁকোও। এ সময় এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার একমাত্র বাহন হয়ে ওঠে নৌকা। বন্যার পানিতে মানুষের ক্ষুণ্নিবৃত্তির অন্যতম অবলম্বন ধানক্ষেতগুলোও তলিয়ে যায়। মৌসুমী ঝড়ের 'দুরন্ত দমকা বাতাসে ঘরের বেড়া-চাল পর্যন্ত যখন কাঁপিয়া ওঠে তখন চাষীরা আকাশের দিকে হাত তুলিয়া আরো জোরে আল্লা, আল্লা বলিয়া ফুকারিয়া ওঠে' (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ২)। এমতাবস্থায় সৃষ্টিকর্তার ওপর অগাধ বিশ্বাসে মোনাজাতের পর মুখে হাত বুলিয়ে যেন তারা স্পষ্ট দেখতে পায় 'পানি নামিয়া গিয়াছে, ঝড় শান্ত হইয়া মেঘদলভার হটাইয়া লইয়া গিয়াছে।' অতিবৃষ্টির ফলে যেমন পথ-ঘাট-ক্ষেত-খামার ডুবে যায় তাদের ফসল এবং প্রাত্যহিক জীবনাচারে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তেমনি অনাবৃষ্টির ফলেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন 'মৌসুম' গল্পে দেখা যায়, টানা বৃষ্টিহীনতার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় গ্রামের মানুষগুলোর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে ঘর থেকে ঘরে। প্রকৃতির এই বিরূপতা লেখকের অনবদ্য ভাষাভঙ্গিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে—

> চৈত্র মাস শেষ হয়ে গেল, তবু একফোঁটা জল নেই। এখনো দক্ষিণা হাওয়া কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে মৃদু মর্মর তুলে ঝিরঝিরিয়ে যায়, উদ্দাম হয়ে মৌসুমী সংবাদ আনে না। সময় সময় এমনো হয় যে নারকেল গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। পত্রঝরা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এতো তীব্র রৌদ্রে পুড়ে হঠাৎ বুঝি তার শুকনো ডালে আগুন ঝ'রে যাবে। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১৩২)

দীর্ঘ এই অনাবৃষ্টি কৃষকদের মনে হতাশা জাগিয়ে তোলে, 'তাদের ঘরে ঘরে মনে মনে নামে দুর্ভাবনার অন্ধকার।' আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুবিধাবঞ্চিত প্রকৃতিনির্ভর অসহায় এসব মানুষ তাই পুজো, ব্রত আর পিরের দরগায় সিন্নি দেয়ার মাধ্যমে আসন্ন দুর্ভাগ্যকে এড়ানোর প্রয়াস পায়। 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*) গল্পেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার গ্রামীণ মানুষের দুর্ভোগের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পুরো গল্পটি পত্রাকারে বর্ণিত। গ্রামে বন্যার দৃশ্য সরেজমিনে দেখতে এসেছে এক শহুরে জমিদারনন্দন। তারপর মিতা নামের এক নারীর উদ্দেশে লেখা একটি চিঠিতে বন্যার নানা ঘটনা বর্ণনা করেছে। সে চিঠির সূত্রেই প্রকৃতির চরম বিরূপতার শিকার মানুষের জীবনের চালচিত্র উদ্ভাসিত করেছেন গল্পকার। গল্পে বর্ণিত বন্যাপ্লাবিত গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে স্বল্প জমিতে যেটুকু ফসল ফলায় তাই দিয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করে তারা। কিন্তু 'যে জীবন ছিল তাও ভেস্তে গেছে বন্যায়'। গ্রামবাসীর দুর্দশা ও বন্যার স্বরূপ লেখকের ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে এভাবে :

> পানি থৈ থৈ করছে চতুর্দিক। বড়ো তাল-নারকেল গাছগুলিও কোমর সমান পানিতে ডুবে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং পানি যে কতখানি তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে। এই বিস্তীর্ণ এলাকার সব লোকেরা জায়গা নিয়েছে জেলা বোর্ডের উঁচু রাস্তাটার ওপরে; ঘরের চাল খুঁজে খুঁজে ভাসিয়ে এনে তারি ওপরে ছাউনি তুলেছে; বৃষ্টি হলে তার মধ্যে ঢোকে আবার থামলে বাইরে এসে ঝিমায়। (শামসুদ্দীন, ১৯৫৩ : ৮৭-৮৮)

বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী অঞ্চলের আরেক পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ নদীভাঙন। 'জোর যার' *(শাহের বানু)* গল্পে নদী ভাঙনের ফলে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা হারিয়ে আশ্রয়হীন মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রামের এককালের অবস্থাসম্পন্ন কৃষক রহম আলীর বাড়িটি নদীর তীরে অবস্থিত। সবসময়ই নদীভাঙনের আশঙ্কার মধ্যে থাকে রহম আলীর গোটা পরিবার। আশেপাশে কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই তার। তাছাড়া আকালের দিনে অভাবের সংসারে সকলেই নিজ নিজ ঘরসংসার সামলাতে ব্যস্ত। এ কারণে বসতবাড়িটি যদি নদীগর্ভে চলেই যায় তাহলে সন্তান-সন্ততি নিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবে ভেবে পায় না রহম আলী। এমন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে রহম আলীর মানসিক অবস্থা ফুটে ওঠে নিচের গল্পাংশে :

> এদিকে নদী ক্রমান্বয়ে আগাইয়া আসিতেছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও তাহার ছলাৎছল জলকল্লোলে ধ্বংসের করতালি শুনিতে পায় রহম আলী। এক রাত্রেও ঘুমাইতে পারে না। চাপ চাপ মাটি ভাঙিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের এক একশানা পঞ্জরাস্থি ও মন যেন ভাঙিয়া পড়ে। স্ত্রী, মরিয়ম, সাত বছরের ছোট ছেলেটি সকলেই তো সর্বদা তটস্থ। কোন সময় যে এক বিরাট চাপশুদ্ধ তাহারা ঘরবাড়ি সমেত নদীর গর্ভে লুপ্ত হইয়া যাইবে কে জানে! (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ১২৮)

'মজা গাঙের গান'-গল্পে নদীভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ গল্পের সম্পন্ন ঘরের গৃহিনী বরুজান পরিবার পরিজন সহায় সম্পত্তি হারিয়ে এখন নিঃস্ব। শুকিয়ে যাওয়া খালের ধারে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন তার। একদিন আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় তার বিয়াই সম্পর্কের এক বৃদ্ধ আত্মীয়। নদীভাঙনে নিঃস্ব হয়ে দেশান্তরী হয়েছে সে বিয়াই। দীর্ঘদিন পর ঘটনাক্রমে আবার সাক্ষাৎ ঘটে সর্বস্বহারা দুই নিঃসঙ্গ মানুষের মধ্যে। গল্পটিতে জীবন আর প্রকৃতির বিরূপতা নানাভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। বরুজানের বাড়ির ধারের একসময়কার উত্তাল স্রোতস্বিনী এখন মৃতপ্রায়, বৃদ্ধ আত্মীয়টির ভাষায়, 'এত বড় গাঙটা আছিলো ঐখানে তা কোন ফুসমন্তরে এমন করিয়া হাওয়ায় উড়িয়া গেল?' এ যেন তাদের দুজনের জীবনেরই এক প্রতিরূপ। নদীভাঙন ও খরাসহ প্রকৃতির বিরূপতা ছাড়াও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রবল দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পটিতে। তবু এরই মধ্যে জীবনকে নতুন করে সাজানোর স্বপ্ন দেখে দুই প্রবীণ। বরুজানের ভাষায়, 'মনে কয় বেয়াইর সঙ্গে আবারও সাক্ষাৎ হইবে বলিয়াই এই ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছিলাম।' বাড়ির ধারের মজা গাঙে সামান্য খুড়লেই টলটলে পানির দেখা মেলে। বিরূপ প্রকৃতিকে জয় করে নতুন করে জীবনবৃক্ষে নতুন করে ফুল ফোটানোর ইঙ্গিতও মেলে এই তথ্যের মধ্যে।

পেশা ও জীবিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটি দিয়ে গড়া সমতলভূমি কৃষির জন্য অত্যন্ত অনুকূল। স্বভাবতই কৃষিকে আশ্রয় করেই জীবিকার অবলম্বন খোঁজে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে কৃষিজীবী ছাড়াও মাঝি, জেলে, পোস্টমাস্টার, ইত্যাদি নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের যাপিত জীবনের চিত্র উঠে এসেছে। তাঁর বিভিন্ন গল্পে বিধৃত হয়েছে প্রান্তিক মানুষদের দারিদ্র্যপীড়িত, শোষণ-বঞ্চনাময় জীবনকাহিনী। 'ইতিকথা' (*শাহেরবানু*), 'পৌষ' (*শাহেরবানু*), 'শেষপ্রহর' (*শাহেরবানু*), 'শাহের বানু' (*শাহের বানু*), 'কেরায়া নায়ের মাঝি' (*শাহেরবানু*), 'শেষ প্রহর' (*শাহেরবানু*), 'মুক্তি' (*শাহেরবানু*) 'হঠাৎ' (*অনেক দিনের আশা*), 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*), 'মদনমাঝির গেলেপতার' (পথ জানা নাই), 'নবমেঘভার' (*দুই*

হৃদয়ের তীর), প্রভৃতি গল্পে নিম্ন পেশাজীবী মানুষগুলো কখনো প্রকৃতি আবার কখনো গ্রাম্য জোতদার-মহাজনদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবননির্বাহ করে। ফলে দিনান্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটে না, বরং দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে ক্রমশ নিপতিত হয়। আর এই অভাব-দারিদ্র্য পারিবারিক কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত নানা সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

'সরজমিন' গল্পে এক অজপাড়াগাঁয়ের চিত্র বর্ণিত হয়েছে, যেটিকে লেখক বলেছেন 'এতই নগণ্য যে হয়তো মানচিত্রেও নেই'। সে গ্রামের অধিবাসীরা কৃষিজীবী। স্বল্প জমিতে প্রাণান্ত পরিশ্রমে যে পরিমাণ ফসল তারা ফলায় তাতে তাদের জীবন কোনোরকমে কেটে যায়। এ গ্রামের কৃষকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লেখক বলছেন :

> সে কী জীবন! জীবিত থাকা যাকে আমরা বলি সে লক্ষণ তো কারো মাঝে দেখলুম না। এ যেন বোঝা; কোনোমতে এরা টেনে চলেছে। মাঝে মাঝে যখন পারে না, থেমে পড়ে মূঢ়ের মতো, এদিক ওদিক তাকায়। সে চোখ গরুর মতো। অসহায়, স্পষ্ট কোনো ভাষা নেই, কিন্তু বেদনাটা উচ্চারিত। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ৮৭)

গ্রামের দরিদ্র কৃষক রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ধান ফলায়। সেই ধান বিক্রি করে কোনোমতে আধপেটা খেয়ে দিনাতিপাত করে; অথচ সমাজের তথাকথিত উঁচুশ্রেণির মানুষ কৃষকদের কঠোর শ্রমে উৎপন্ন চাল নিয়ে করে বিলাসিতা। 'সরজমিন' গল্পে এ বিষয়টিও অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় তুলে ধরেছেন লেখক—যে কৃষকদের রক্ত পানি করা পরিশ্রমের ফসল 'কালিজিরা ধানের চাল না হলে আমাদের ডাইনিং টেবিল পোলাওয়ের গন্ধে ভুরভুর করে না' 'বালাম, রূপশালী, কনকভোগ আর বাকতুশী-র যে চাল ছাড়া আমাদের খাওয়া হয় না' তা এদেরই পরিশ্রমলব্ধ। অথচ দিনান্ত পরিশ্রম করে তাদের কপালে দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না। এ গল্পের দরিদ্র বর্গাচাষী লালু খাঁর জীবনে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অন্ন ও চিকিৎসার অভাবে তার স্ত্রী ও তিন সন্তানের করুণ পরিণতির চিত্র বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। অভাবের সংসারে লালুকে জীবনসংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে তার স্ত্রী জোবেদা। লালুকে গঞ্জনা না দিয়ে নিজেই সামলে নিত ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দনরত শিশুকে। একদিন ছোট মেয়েটিকে ভাতের থালা সামনে নিয়ে কাঁদতে দেখে এর কারণ জোবেদার কাছ থেকে জানতে না পারলেও রাতে ছোট ছেলেটির কাছে জানতে পারে–জোবেদা কীভাবে প্রতিদিন ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে ছোট মেয়েটিকে পানির সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খাইয়ে শান্ত করে। এরই মধ্যে হঠাৎ চালের দাম বেড়ে গেলে চরম কষ্টে নিপতিত হয় পরিবারটি। ওদিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে লালু। এতদিন জোবেদা সন্তানদের শাক-পাতা খাইয়ে কোনোরকম দিনাতিপাত করছিল। কিন্তু একদিন বিলের জলে কলমী শাক তুলতে গিয়ে মৃত্যু ঘটে জোবেদার। শুধু জোবেদা নয়, পরবর্তীতে একে একে প্রাণ হারায় তার পরিবারের অন্য সদস্যরাও। তীব্র অন্তর্যন্ত্রণায় দগ্ধ লালুর উক্তি : 'একটা না দুইটা না তিনটা পোলাও আমার এইখানে শুইয়া আছে। খিদা লইয়া, আফছুছ লইয়া- লাখে লাখে!'

নতুন ফসলের জন্য প্রান্তিক কৃষক হোসেনের যুগপৎ আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা 'ইতিকথা' গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যে ফসলের অপেক্ষায় তারা তীর্থের কাকের মতো অধীর আগ্রহে থাকে সে ফসলের ফলন ভালো না হলে তাদের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। সারা বছর তারা অপেক্ষা করে নতুন ধান ঘরে এলে সে ধান বিক্রি করে ধার-কর্জ শোধ করবে, নিত্য প্রয়োজনীয় নানান চাহিদা মেটাবে এবং পরিবার-পরিজনের সদস্যদের শখ-আহ্লাদও মেটাবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষিদের এই অধীর অপেক্ষার পরিণতি সুখকর হয় না। হোসেনের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আশানুরূপ ফলন না হওয়ায় হোসেনের জীবনে দেখা দেয় চরম দারিদ্র্য যার পরিণতিতে ঘটে দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি এবং সংসার জীবনের অশান্তি। এই গল্পের হোসেন সহজ-সরল নির্বিরোধ চরিত্র। সংসারে তার দৈন্যদশা। অথচ নিশাচর করিম, ডাকাত মদন

মাঝি, আতাহার মুন্সী, জবান খাঁ-দের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত নেই। দারিদ্র্য-জর্জরিত সংসারের টানাপড়েনে ক্লিষ্ট হোসেনের স্ত্রী জরিনাও একসময় স্বামী হোসেনকে চৌর্যবৃত্তিতে প্ররোচিত করে। কেননা জরিনা মনে করে, 'ভালমানুষীতে মরণ ছাড়া গতি নাই।' জরিনার প্ররোচনায় চৌর্যবৃত্তি শুরু করলেও অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে হোসেন। তার বিবেক ও নীতিবোধ তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হোসেনকে সাহস যোগায় তার স্ত্রী জরিনা। চুরির মত গর্হিত অপরাধকেও এক ধরনের বৈধতা প্রদানের চেষ্টা থেকে জরিনা বলে—

> চোর কে না? শুধু করিমের নাম কেন? গু খায় সব মাছে, নাম পড়ে পাঙাসের। গ্রামের মাতব্বরেরা কী করে? জবান খাঁ কী শয়তানি করিয়া তোমার দু' কুড়া জায়গা নিয়ে নিলে; কিন্তু সেজন্য তাকে চোর বলার সাহস আছে তোমার? (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ২৩)।

এক পর্যায়ে হোসেনেরও ভাবনালোকে পরিবর্তন আসে। তারও মনে হয়, 'কীই বা পুণ্য-পাপ! অসৎ নয় কে?" আর ন্যায়-অন্যায়ের এসব জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নিজের আহত বিবেককে শান্ত রাখার চেষ্টা করে হোসেন।

ভাগ্যহত কৃষক একদিকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে, অন্যদিকে জমিদার-মহাজন-জোতদারের খাজনা আদায়, ঋণ পরিশোধের তাগাদায় অতিষ্ঠ তাদের জীবন। এ যেন "জলে কুমির ডাঙায় বাঘ" প্রবাদেরই বাস্তব প্রতিফলন। 'পৌষ' গল্পে এমনই বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে দরিদ্র তাজুর মর্মন্তুদ জীবনচিত্রে। গ্রামের সমবায় কৃষিঋণ সমিতির ঋণের টাকায় বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কায়ক্লেশে ফ্যান-ভাত খেয়ে কোনোমতে দিনাতিপাত করে সে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ফসলের উৎপাদন ভালো না হওয়ায় অনাগত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় তার মন ভারাক্রান্ত। ধান বিক্রির সামান্য টাকায় কীভাবে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করবে; ধার শোধ, খাজনা, খাওয়া-পরা এসব সম্পন্ন করবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিশেহারা তাজু। সামন্তপ্রভু হলধর চক্রবর্তীর সুদের টাকা শোধের তাগাদাও তাকে বিচলিত করে। তাই তাজু হিসেব কষতে থাকে–ধান বিক্রির টাকায় হলধর চক্রবর্তীর কর্জ শোধ করবে, নাকি সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করবে। গল্পের শেষে দেখা যায়, পাওনা টাকা চাইলে উচিত-অনুচিতের বোধ হারিয়ে হলধর চক্রবর্তীর সহচর হাকিমের গলা চেপে ধরে নিজের অব্যক্ত ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করে তাজু। পরিণতিতে তার শেষ সম্বল ভিটেমাটি হারাতে হতে পারে জেনেও বুকের মধ্যে জমে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশে পিছপা হয় না তাজু।

গ্রামের এক দরিদ্র পোস্টমাস্টার মাজু মিয়ার জীবনের করুণ পরিণতির চিত্র ফুটে উঠেছে 'নবমেঘভার' গল্পে। স্বল্প বেতনভুক মাজু মিয়ার জীবনে স্বপ্ন আর উচ্চাশা ছিল অনেক, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সেসব স্বপ্নের কোনোটিই পূরণ হয়নি। বরং দারিদ্র্যের কশাঘাতে চোখের সামনে সেসব স্বপ্নের নির্মম মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়েছে সে। কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করে পিতার অকাল মৃত্যুতে সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়ে সামান্য বেতনের পোস্টমাস্টার হতে হয়েছে মাজু মিয়াকে; যে একসময় কবিতা লিখত আর জীবনে বড় কিছু হবার স্বপ্ন দেখত। স্থানীয় এক অবস্থাপন্ন পরিবারে বিয়ে করেও দারিদ্র্যের ছোবল থেকে মুক্তি পায়নি মাজু মিয়া বরং দিনে দিনে সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। কারণ ধনী পিতার কন্যা মনিরা দরিদ্র পোস্টমাস্টারের সংসারে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। ফলে অহর্নিশ কলহ বিবাদ লেগে থাকে দুজনের মধ্যে। একটি কন্যা সন্তানের জন্মও তাদের অসুখী সংসারে সুখের প্রদীপ জ্বালাতে ব্যর্থ হয়। দিনের পর দিন স্ত্রীর তীব্র বিষোদগার চলে সৎ সহজ-সরল মাজু মাস্টারের ওপর। এক পর্যায়ে স্ত্রী মনিরা সংসার ছেড়ে চলে গেলে সংসারক্ষেত্র থেকে চিরকালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায় জীবনসংগ্রামে পরাস্ত মাজু মিঞা। অনেক উৎসাহ আর উদ্যম নিয়ে সংসারী হওয়ার চেষ্টা করে মাজু মিয়া, কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

'হঠাৎ' গল্পের মফেজ আলীর পেশা কাঠের কারবার। সুন্দরবন থেকে কাঠ কেটে এনে নিকটবর্তী জনপদে বিক্রি করে সে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রত্তনকে এই কাজের জন্য মাসিক চল্লিশ টাকা মজুরিতে নিয়োগ করে মফেজ আলী। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্যজীবী মানুষের সংখ্যাও প্রচুর। মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায় তারা। 'শাহের বানু' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাজেদ গ্রামের খাল-বিল থেকে মাছ ধরে শহরে নিয়ে বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। সে ভালবাসে শাহের বানু নামের একটি মেয়েকে। গ্রামের নদী-নালা-খাল-বিল থেকে মাছ ধরে সেগুলো শহরের বাজারে বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে সংসার চালায় সে। মাছ বিক্রির টাকায় সংসারের ব্যয় নির্বাহ তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ভালোবাসার মানুষ শাহের বানুকে একটি শাড়ি উপহার দিতে চায় সে, কিন্তু কাছারির খাজনা পরিশোধের দায় থাকায় সেই ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হয়। খাজনা পরিশোধ নাকি প্রেয়সীর বায়না মিটানো–এমন এক উভয় সংকটে পড়ে মাজেদের মনের শান্তি উধাও হয়ে যায়, নৈতিক মূল্যবোধেরও অবনতি ঘটে। ফলে বাজারের হাশেম মোল্লার দোকানের গদিতে বসা তার আট বছরের কন্যা শিশুর চোখ ফাঁকি দিয়ে হাতবাক্স থেকে টাকা চুরি করার চেষ্টা করে, কিন্তু মেয়েটি দেখে ফেলে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বাটখারা দিয়ে মেয়েটিকে আঘাত করে মাজেদ, তারপর ধরা পড়ার ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে। সেখানেই মেয়ের পিতার কোঁচের আঘাতে জীবন দিতে হয় তাকে।

'কেরায়া নায়ের মাঝি' গল্পে কেরায়া নৌকার দরিদ্র মাঝি আজহার। স্ত্রী জমিলা এবং দুই পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন। কেরায়া বাওয়া ছাড়াও 'ধুলোট কৃষির সময় সকাল সন্ধ্যা খাটুনি, একা একা জোঁকের কামড় খেয়ে বর্গাক্ষেতে বীজ বুনোনো, চাই বুনে মাছ ধরা, হাটে বিক্রি করা' ইত্যাদি নানা কাজ করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে আজহার। তার সন্তানেরাও খাল-বিল থেকে শাপলা তুলে সেগুলো হাটে বিক্রি করে। কিন্তু তাতেও অভাব মেটে না। গল্পের এক পর্যায়ে দেখা যায়, আজহারের ছোট ছেলে কাশেম ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থাসম্পন্ন মুন্সীবাড়ির শসার মাচা থেকে একটি ছোট শসা ছিঁড়েছে বলে তাকে প্রহার করে সে বাড়ির ছোট মিয়া। এ ঘটনায় সংসারের ঘানি টানতে টানতে ক্লান্ত-বিপর্যস্ত জমিলার খেদোক্তি—

> পোলাগো খাওয়াইতে পারবা না, হেরা এরডা ওরডা যাইয়া ধরবে, এর দুয়ারে চাইবে ফ্যান, ওর দুয়ারে খুদ। কেউ কিছু না দিলে খাওনিয়া জিনিস পাইলে খাইবে আবার হেইয়ার উপরে যদি খায় অন্যায় মাইর, তউ তুমি কিছু কইতে পারবা না? [...] কয়দিন ধইরা পেটে ভাত পড়ে না খেয়াল আছে? [...] কিছু কইতে পারবা না, খাইতেও দেতে পারবা না, তয় জন্ম দেছেলা ক্যা? (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ৫২-৫৩)

সন্তানদের ক্ষুধার্ত মুখ, স্ত্রীর ভৎর্সনা সহ্য করতে না পেরে আজহার অসুস্থ শরীর নিয়েই কেরায়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চাল-ডাল নানা সওদাপাতি করেও আনে কিন্তু বাড়ি পৌঁছানোর আগেই নৌকাতেই তার করুণ মৃত্যু ঘটে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত নানা পেশার সাথে এমন কিছু পেশারও দেখা মেলে যেগুলো আইন ও সমাজের কাছে অগ্রহণযোগ্য। যদিও দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেঁচে থাকার তাগিদে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শেষ অবলম্বন হিসেবে অনেকে বেছে নেয় এসব পেশা। যেমন: চুরি ও ডাকাতি। এদের সিংহভাগই ছিঁচকে চোর বা সিঁধেল চোর। আশপাশের বাগানের নারিকেল-সুপারি, ফল-ফলাদি চুরি করে বা সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা। চুরি করা দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে সংসারের চাহিদা মেটায়। রাতের বেলা চুরি করলেও দিনের বেলা সাধারণ মানুষের সাথে স্বাভাবিকভাবেই তারা মেলামেশা করে। 'ইতিকথা' গল্পে এরকমই এক চোর–'সবার পরিচিত করিম চোর'-এর উল্লেখ রয়েছে। লেখকের ভাষায় তার চৌর্যবৃত্তির বর্ণনা—

> রোজ রাতে গ্রামের বুক চিরে প্রবহমান খালে তার ছোট ডিঙিখানা সন্তর্পণে নিশীথের অভিসারে বেরোয়। কোথায় যায় কী করে অন্ধকারে জানা না গেলেও, ভোরের বেলা আশেপাশের গ্রামের বাগানের মালিকেরা দেখে তাদের বাগানের নারকেল, সুপুরি সাফ হয়ে গেছে; আর ক্বচিৎ কেউ কখনও দেখে ফেলে যে, বন্দরের দিক থেকে করিম নিশ্চিন্ত মনে নৌকো নিয়ে বাড়ি ফিরছে। নৌকোর মধ্যে হোগলা পাতায় ঢাকা হরেক রকম সওদা। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১৭)

অনেক সময় অসাধু উপায়ে উপার্জন করে স্বচ্ছল জীবনযাপনও করে কেউ কেউ। দারিদ্র্যের কারণে অনেকেরই নীতিবোধ দুর্বল হয়ে যায়। তাদের কাছে তাই যেনতেন প্রকারে বেঁচে থাকাটাকেই সবচেয়ে বড় সার্থকতা বলে মনে হয়। 'ইতিকথা' গল্পেও অভাবজনিত কারণে দাম্পত্য কলহ এবং নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পের হোসেন সহজ-সরল নির্বিরোধ চরিত্র। সংসারে তার দৈন্যদশা। অথচ নিশাচর করিম, ডাকাত মদন মাঝি, আতাহার মুন্সী, জবান খাঁ-দের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত নেই। দারিদ্র্য-জর্জরিত সংসারের টানাপড়েনে ক্লিষ্ট হোসেনের স্ত্রী জরিনাও একসময় স্বামী হোসেনকে চৌর্যবৃত্তিতে প্ররোচিত করে। জরিনা মনে করে, 'ভালমানুষীতে মরণ ছাড়া গতি নাই।' তাছাড়া— 'আজকালকার এমন দিনে নীতি ধর্মের শিকল পরে ভালোমানুষী করা যে আত্মহত্যারই শামিল।' এক পর্যায়ে স্ত্রীর প্ররোচনায় হোসেনের মত সহজসরল নির্ভেজাল ভালোমানুষও চৌর্যবৃত্তিকে বেছে নেয় জীবনধারণের অবলম্বন হিসেবে। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গিয়ে যারা এসব অনৈতিক পেশা অবলম্বন করে তাদের মুখে সমাজের অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের যে চিত্র ফুটে ওঠে তাতে মনে হয়, বিত্তবান মানুষেরা যদি একটু দয়ার্দ্র হতো তাহলে হয়ত চৌর্যবৃত্তির মতো এমন পেশা তারা বেছে নিতো না। এ প্রসঙ্গে করিম আর হোসেনের কথোপকথন স্মর্তব্য, যেখানে হোসেনের কাছে চৌর্যবৃত্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে করিম এভাবে :

> আতাহার মুন্সীর ঘরে কত চাউল আছে তা জানো? এক সের চাউলও তার কাছে ধার পাওয়া যায় না। যাবা আজ আমার সঙ্গে তার কিছু নামাইয়া আনতে?
> : ডাকাতি? চমকে উঠল হোসেন।
> : না না, ডাকাতি কেন, সিঁধ কাটিয়া কিছু নামাইয়া আনমু। মুন্সীর ঘরের পিছন দিকেই গোলা, কী করতে হইবে না হইবে সব আমি ঠিক করইয়া রাখছি। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ২৪)

তবে জরিনার প্ররোচনায় চৌর্যবৃত্তি শুরু করলেও অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে হোসেন। তার বিবেক ও নীতিবোধ তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হোসেনকে সাহস যোগায় তার স্ত্রী জরিনা। চুরির মত গর্হিত অপরাধকেও এক ধরনের বৈধতা প্রদানের চেষ্টা থেকে জরিনা বলে—

> চোর কে না? শুধু করিমের নাম কেন? গু খায় সব মাছে, নাম পড়ে পাঙাসের। গ্রামের মাতব্বরেরা কী করে? জবান খাঁ কী শয়তানি করিয়া তোমার দু' কুড়া জায়গা নিয়ে নিলে; কিন্তু সেজন্য তাকে চোর বলার সাহস আছে তোমার? (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ২৩)।

এক পর্যায়ে হোসেনেরও ভাবনালোকে পরিবর্তন আসে। তারও মনে হয়, 'কীই বা পুণ্য-পাপ! অসৎ নয় কে?" আর ন্যায়-অন্যায়ের এসব জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নিজের আহত বিবেককে শান্ত রাখার চেষ্টা করে হোসেন।

'মদনমাঝির গেলেপতার' গল্পে মদন একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত এবং এই গল্পে তার জীবনাখ্যানই প্রতিফলিত হয়েছে। মদন মাঝি নৌপথে ডাকাতি করে। তার নাম শুনলে যাত্রীরা ভয়ে 'খরগোশের মতই কাঁপে', তা 'পারতপক্ষে ঐ দশ পঁচিশখানা গাঁয়ের পাশের প্রায় মাইল দশেক গাঙ এলাকায় কোনো নাও চলে না।' অথচ মদন মাঝির দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা শুনে সবাই শিউরে উঠলেও তার ছিল একটা কোমল হৃদয়। গরিব মানুষের প্রতি সে ছিল অত্যন্ত

সহানুভূতিশীল। যাদের আছে তাদের লুট করাই তার পেশা এবং নেশা। সেই লুট করা অর্থে-সম্পদে উপকথার রবিন হুডের মতো বহু গরীবকে সে বাঁচিয়ে রাখে। এ কারণে মদন মাঝির নৃশংসতার কথা জানলেও দরিদ্র মানুষরা কখনও তাকে শত্রু ভাবত না। আবার তাকে লোকে ভালোওবাসতো না। 'অনেক দিনের আশা' গল্পের আয়নদ্দিও চৌর্যবৃত্তিতে নিয়োজিত। মন্বন্তরের ফলে উপায়ান্তর না দেখে এ কাজে জড়িয়ে পড়ে সে। সমাজের ধিক্কার সত্ত্বেও এই পেশাকে পাল্টানোর কোনো উপায় খুঁজে পায় না।

'শেষ প্রহর' গল্পের দরিদ্র কৃষক হোসেন বিয়ে করে 'চোর' নামে খ্যাত আজহারের কন্যা রাবেয়াকে। বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে তার অভাব আরো বেড়ে যায়। সর্বগ্রাসী অভাবের করাল ছোবলে হোসেনের সুখ-শান্তি উধাও হয়ে যায়। অভাবের বিধ্বংসী থাবায় হোসেনের নীতি-নৈতিকতায় ধস নামে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ এবং স্ত্রীর প্ররোচনায় হোসেন নিজেও এক পর্যায়ে যোগ দেয় চৌর্যবৃত্তিতে। অভাব-অনটন ও দাম্পত্য কলহের জের ধরে স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে হোসেন এবং সেবা-শুশ্রূষার অভাবে মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে 'মুক্তি' গল্পে অভাবের তাড়নায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। হতদরিদ্র চেরাগ আলী ঝোঁকের মাথায় জায়গাজমি বিক্রি করে দূরদেশ থেকে বিয়ে করে এনেছিলো সুন্দরী জয়তুনকে। একপর্যায়ে তাদের কোলজুড়ে আসে সন্তান। কিন্তু এতে নির্মল আনন্দের পরিবর্তে সংসার বৃদ্ধির ফলে অভাব আরো ঝেঁকে বসে। আবার এরই মধ্যে শুরু হয় আকাল। অর্ধাহার-অনাহারে থেকে চেরাগ আলী আর জয়তুনের দিশেহারা অবস্থা; পরিণামে শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যেহেতু মূলত গৃহকর্তার আয়-উপার্জনের ওপর নির্ভর করে সেহেতু সংসারের অভাব অনটনের দায়ভারও বর্তায় গৃহকর্তা চেরাগ আলীর ওপর। তার নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় স্ত্রীর গঞ্জনা। দাম্পত্য ও পারিবারিক অশান্তি তীব্র রূপ ধারণ করে একমাত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুতে। এই মৃত্যুর জন্য চেরাগ আলীর দারিদ্র্যকেই দায়ী করে জয়তুন। সন্তানের বিয়োগব্যাথায় পাগলপ্রায় হয়ে যায় সে। সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ চেরাগ মিলিটারির দালাল চৈতন দাসের কাছে ৫০ টাকার বিনিময়ে জয়তুনকে বিক্রি করে দেয়। সে মনে করে, এবার বুঝি মুক্তি পাওয়া যাবে দারিদ্র্যজীর্ণ এই সংসার জীবন থেকে, মৃত্যু থেকে পাওয়া যাবে নিষ্কৃতি।

সামন্তপ্রভু ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য

বিশ শতকের শুরুতে ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘুণপোকার মতো ভেতরে থেকে সামন্তসমাজের ভাঙনের সূচনা করে। পুরনো মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা, অনুশাসন এবং রীতিনীতি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে শুরু করে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এই প্রক্রিয়াটি ধীরগতিতে এলেও সময়ের পরিক্রমায় সেটি ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। সামন্তপ্রভুরা প্রাণান্ত চেষ্টা করে গ্রামজীবনে তাদের মৌরসি-পাট্টা জারি রাখতে; কিন্তু সময়ই তখন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। শোষণ ও নির্যাতনের পাল্লা ভারি করে সামন্তসমাজ চেষ্টা চালায় তাদের ক্ষয়িষ্ণু আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখতে। ফলে বিশ শতকের প্রথমার্ধে সাধারণ প্রতিবাদী জনতার সাথে সামন্তপ্রভু ও তাদের বশংবদদের সংঘাতের ঘটনা বাড়তে থাকে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম-এর 'পৌষ' (*শাহের বানু*), 'অনেক দিনের আশা'(*অনেক দিনের আশা*), 'পৌষস্বপ্ন'(*অনেক দিনের আশা)*, 'দুর্যোগ' (*অনেক দিনের আশা*) 'কলাবতী' (*অনেক দিনের আশা)*, 'কালীদহের তীরে' (*অনেক দিনের আশা*), 'মৌসুম'(*অনেক দিনের আশা*) প্রভৃতি গল্পে গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের ওপর সামন্তপ্রভু বা মাতব্বরশ্রেণির দৌরাত্ম্যের বিচিত্র দিক উন্মোচিত হয়েছে। গ্রামীণ সমাজ মোটা দাগে দুটি ভাগে বিভক্ত : শোষক আর শোষিত। কৃষিজমি, নগদ টাকা বা নানা সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে শোষক শ্রেণি আবহমান কাল ধরে সাধারণ মানুষদের ওপর তাদের অত্যাচারের জোয়াল চাপিয়ে দেয়। দুর্দিনে ধার দেয়া টাকা পরিশোধ করতে না পারলে

ছিনিয়ে নেয় জায়গা-জমি। শুধু জমি গ্রাস নয়, নারীদের প্রতিও রয়েছে তাদের লোলুপ দৃষ্টি। তাই অসহায় নারীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নিজেদের কামনা চরিতার্থ করতে চায়।

'পৌষ' গল্পে দরিদ্র কৃষক তাজু অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে পৌষ মাসের। কেননা, 'চাষীজীবনের সেরা সময় পৌষ মাস; বুকে আসে অনেক শ্বাস, পায় অনেক আশা পূরণের আশ্বাস'। কিন্তু সে আশায় ছন্দপতন ঘটে যখন মনে হয়, ফসল বিক্রির সামান্য টাকায় শোধ করতে হবে ধারকর্জ। তাছাড়া এসময় মহাজনের লোকজন পাওনা টাকা সুদে-আসলে পরিশোধ করে নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। ফলে ফসলের হাতছানির মধ্যেও তাজুর মনে অহোরাত্রি জেগে থাকে সামন্তপ্রভু হলধর চক্রবর্তীকে অর্থ পরিশোধের তাগাদা। তার আশঙ্কা যে-মানুষ হলধর চক্রবর্তী, কোন দিক দিয়ে কোন প্যাঁচ কষে অধিকতর এক বিপদে ফেলবে তা ভাল করে খেয়ালও করতে পারবে না। ধান বিক্রির টাকায় মাকে একটি কাপড় কিনে দেবে, নাকি ধার শোধ করবে—এই টানাপড়েনে তাজু অস্থির। এজন্যই ধান বিক্রি করে হাট থেকে প্রায় পালিয়েই বাড়ি ফিরছিল তাজু; কিন্তু ঠিকই হলধর চক্রবর্তী আর তার বশংবদ হাকিম খাঁর চোখে পড়ে যায় সে। বাধ্য হয়েই টাকাটা তুলে দিতে হয় তাদের কাছে, কিন্তু হাতের সম্বল টাকাগুলো বাঁচাতে না পারার আক্ষেপ দ্রুতই আক্রোশে রূপান্তরিত হয় এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হাকিম খাঁকে আক্রমণ করে বসে তাজু। হাকিমও পাল্টা আক্রমণ করে তাজুকে। উত্তেজিত মুহূর্তে বেসামাল আচরণ করলেও পরক্ষণেই অনিশ্চিত পরিণতির আশঙ্কা গ্রাস করে তাজুকে। হলধর চক্রবর্তী হয়ত এবার তার ভিটেমাটি গ্রাসের সুযোগ পেয়ে যাবে—এই ভাবনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে সে এবং গল্পটির শেষ হয় শোষকশ্রেণির মনে শোষিতের প্রতি অনুকম্পা জাগবে, এ আশাবাদের মধ্য দিয়ে। 'শাহেরবানু' গল্পে দরিদ্র মৎস্যজীবী মাজেদের মাকেও দেখা যায় সামন্তপ্রভুর পাওনা টাকা পরিশোধ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে; তাঁর ভাষ্যে নিঃসহায় মানুষের চিরন্তন আশঙ্কাই যেন মূর্ত হয়ে উঠে—অনেক টাকা বাকী পড়েছে, এখন হতেই ধীরে ধীরে শোধ করে না দিতে থাকলে কোন দিন কি বিপদ হয়ে যাবে, তখন আর উদ্ধারের উপায়ও পাওয়া যাবে না।

সমাজপতিদের নারীলিপ্সার প্রসঙ্গও এসেছে একাধিক গল্পে। 'অনেক দিনের আশা' গল্পের দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন নারী ফুলজান গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ও ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি বড়োমিয়ার ইন্দ্রিয়জ লোলুপতার শিকার। ফুলজান বড়োমিয়াকে নানাভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তবু নির্লজ্জ বড়োমিয়া 'হাতিনায় বসে পান চায়, তামাক চায়, চোখ নাচিয়ে মশ্‌করার চেষ্টা করে'। অবশেষে নিজের স্বার্থে নয়, বরং নিজের ভালোবাসার মানুষ চুরির অপরাধে ফেরারি আয়নদ্দিকে আইনের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই বড়োমিয়ার কাছে নিজের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয় ফুলজান।

'পৌষস্বপ্ন' গল্পের তালুকদারও এ শ্রেণির মানুষ। এ গল্পের দরিদ্র কৃষক মালেক ক্ষুণ্নিবৃত্তির আশায় তার স্ত্রী মকুকে সঙ্গে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে শহরে যাওয়ার আগে তালুকদারের কাছে নিজের জমি বিক্রি করে এবং বসতবাড়ি বন্ধক রাখে। কিন্তু সেখানেও ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। একপর্যায়ে অভাব-অনটনে বিপর্যস্ত মালেকের মৃত্যুর পর নিঃস্ব অসহায় মকু গ্রামে ফিরে এসে নিজের বাড়িতে পা রাখার সাথে সাথেই তালুকদারের আগমন ঘটে। মকুকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তালুকদার দাবি করে যে মকুর স্বামী মালেক কেবল বাড়ি বন্ধকই নয়, বিক্রিও করে দিয়েছে। কেবল বাড়ি গ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় না তালুকদার। মকুর দিকে সে তার লালসার হাতও বাড়িয়ে দেয়। নির্দয় এই পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার আর নির্মম বাস্তবতা মকুকে স্তব্ধ করে দেয়। এরই মধ্যে বন্য শিয়ালের হাতে মারা পড়ে মকুর কোলের সন্তান। এরপর তালুকদার যখন পুনরায় থাবা বিস্তার করে, তখন মকু ব্যর্থ হয় নিজেকে রক্ষা করতে। বন্য শেয়াল আর মানুষরূপী শেয়ালের থাবায় সর্বস্বান্ত হয়ে যায় সে।

এ ধরনেরই আরেক দুশ্চরিত্র পুরুষ 'দুর্যোগ' গল্পের সুন্দর মিঞা তালুকদার। মিলিটারির ঠিকাদারি আর মন্বন্তরের সময় চালের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়েছে সুন্দর মিঞা। এ গল্পের অসহায় নারী চরিত্র কাঞ্চনমালা। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করে সে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে কাঞ্চনমালাকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় সুন্দর মিঞা। এক দুর্যোগের রাতে কাঞ্চনমালাকে অপহরণ করে সুন্দর মিঞার ঘরে নিয়ে আসে তার দুষ্কর্মের সহযোগী রহমান। সুন্দর মিঞা সুযোগ পায় তার কামনা চরিতার্থ করার। দুশ্চরিত্র সমাজপ্রভুর কাছে নারীর অসহায়ত্ব বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এ গল্পে। সমাজপতিদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণে পাশাপাশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর রুখে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্তও প্রচুর। 'দুর্যোগ' গল্পে দুশ্চরিত্র সুন্দর মিঞার একের পর এক কুপ্রস্তাবে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে এক পর্যায়ে কাঞ্চনমালা কীভাবে প্রতিবাদী সত্তায় জাগ্রত হয় তা লক্ষ করা যায় নিচের উক্তির মধ্যে :

> মানে মানে সরে পড়ো তুমি–নইলে সারা গাঁয়ে একথা রটিয়ে দেবো। গাঁয়ের অনেক মেয়ে তোমার হাতে গেছে জানি–আমাকেও সে দলের ভেবো না। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১০৫)

গল্পের শেষে সুন্দর মিঞা যখন এক ঝড়বাদলের রাতে রহমানের মাধ্যমে কাঞ্চনমালাকে অপহরণ করে নিয়ে এসে তার নারীত্বের অবমাননা ঘটায়—বিধ্বস্ত, পর্যুদস্ত কাঞ্চনমালা তখন প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখে। লেখকের ভাষায় :

> ঝড়বাদল চিরদিন থাকবে না। সাধ্যমত সুন্দর মিঞা খুঁজুক আজ তার দেহে দুনিয়ার তৃপ্তি; নর্মশ্রান্ত হয়ে ঘুমাক। তারপর জাগবে কাঞ্চন। দেশলাই-এর একটি কাঠিতে এই অন্যায়ের পুরীতে আগুন জ্বেলে বাইরে যেয়ে দুনিয়ার [...] (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১০৯)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের অনেক গল্পেই তালুকদারের মতো এরকম বিবেকহীন প্রভাবশালীদের দেখা মেলে। এরকমই আরেকটি চরিত্র বৃন্দাবন চক্রবর্তী। 'কলাবতী' গল্পে হিন্দু কলাবতী ও মুসলিম মজিদের মধ্যে প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে কলাবতী ও মজিদের জীবনে যে দুর্দশা ঘনিয়ে আসে তাতে ইন্ধন জোগানোর মাধ্যমে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার পরিকল্পনা করে বৃন্দাবন চক্রবর্তী। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধানো, মামলা মোকদ্দমায় প্ররোচিত করার মাধ্যমে কলাবতীর পিতা সুরেন দাসের সম্পত্তি দখল ও কলাবতীর পরিবারকে সমাজে একঘরে করাসহ নানা অপকর্ম করেই ক্ষান্ত হয়নি বৃন্দাবন চক্রবর্তী, কলাবতীর পরিবারের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কলাবতীকে ভোগ করতে চায় সে।

সামন্ত জমিদাররা তাদের কায়েমি স্বার্থকে রক্ষার প্রয়োজনে কিছু সহযোগী সৃষ্টি করেছিল। এদের মধ্যে জোতদার-তালুকদার যেমন ছিল তেমনি ছিল ঠ্যাঙ্গাড়ে লাঠিয়াল বাহিনী, যারা জমিদারের পক্ষে মারপিট থেকে শুরু করে শোষণ-নির্যাতন সবই করত। জমিদার এদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে যেমন পুরস্কৃত করত, তেমনি আদেশ পালনে অন্যথা হলে তাদের ওপর শাস্তির খড়্গ নেমে আসত। 'কালীদহের তীরে' গল্পে এমনই এক কুচক্রী জমিদারের কারণে পাশাপাশি দুটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং পরিণতিতে প্রাণহানিও ঘটে। 'মৌসুম' গল্পের সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরী। জমিদারদের প্রভাব ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হলেও দ্বারিকানাথ শোষণ-নির্যাতনের পথ থেকে সরে আসেনি। অনাবৃষ্টি শেষে বৃষ্টির আগমনে ভালো ফসলের সম্ভাবনায় আনন্দিত গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের মুখের হাসি সে সহ্য করতে পারে না। গ্রামের প্রতিবাদী যুবক রমানাথ ও তার পিতা সখানাথের ওপরই তার ক্ষোভ বেশি। শহরের ক্ষমতাশালী মহলের সাথে নিজের সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে চালের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সখানাথদের দুর্দশাকে প্রলম্বিত করার পরিকল্পনা করে সে। সখানাথের উদ্দেশে দ্বারিকানাথের স্বগতোক্তি তাঁর সামন্তসুলভ মানসিকতারই পরিচায়ক—

> মৌসুম না হয় পেয়েছো-ই, কিন্তু বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে যে আকাল কোন পুঁজি দিয়ে তাকে ঠেকাবে! আমার স্টক করা চালের দাম তখন চড়চড় ক'রে আরো বেড়ে যাবে। তখন কার দুয়ারে মাথা কোটো দেখবো না! (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ১৫২)

এভাবেই শোষক শ্রেণি সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন চালাত। তাদের প্রতি সহানুভূতি-সহযোগিতা তো নয়ই বরং কূট কৌশলের মাধ্যমে তাদেরকে দারিদ্র্যের নাগপাশে আবদ্ধ করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করত। যদিও সময়ের পরিক্রমায় এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়। তরুণ কৃষকদের প্রতিবাদী মনোভাব এ গল্পটিকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

যুদ্ধ ও মন্বন্তরকালীন বাস্তবতা

ভারতবর্ষের জনজীবনে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালব্যাপী সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। "ভয়াবহতা, ব্যাপকতা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, জীবনহানি, ধ্বংসযজ্ঞ প্রভৃতি সবদিক থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে (১৯১৪-১৮) অতিক্রম করে যায়" (আজিজুল, ১৯৯৮ : ২৭২)। এই যুদ্ধে সাত কোটিরও বেশি সাধারণ মানুষ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যের প্রাণহানি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশ হিসেবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অবস্থান ছিল মিত্রশক্তির পক্ষে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপাল) প্রায় ৮৭ হাজার সৈনিক এই যুদ্ধে নিহত হন।[১] শুধু প্রাণহানি নয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির প্রভাবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকার সমস্যা, যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ, মজুতদারি, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট 'সেই সঙ্গে আসে মেদেনীপুরের ঝড় (অক্টোবর ১৯৪২) এবং দামোদরের বন্যা (১৯৪৩)। এই পরিস্থিতির শীর্ষবিন্দু হয়ে ওঠে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর (স্বপন ও হর্ষ, ২০০০ : ১১১)। এই মন্বন্তর প্রধানত গ্রামবাংলার জনজীবনে নিয়ে আসে চরম বিভীষিকা, দুর্ভাগ্য।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের শেষপ্রহর (*শাহের বানু*), পথ জানা নাই (*পথ জানা নাই*), অনেক দিনের আশা (*অনেক দিনের আশা*), হঠাৎ (*অনেক দিনের আশা)*, জীবনের শুভ অর্থ (*পথ জানা নাই*), বজ্র (*পথ জানা নাই*) প্রভৃতি গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। বিশেষত, যুদ্ধোত্তর সংকট, মন্বন্তর, খাদ্যাভাবে মানুষের মৃত্যু, মানবেতর জীবনযাপন, কর্মসংস্থানের অভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হওয়া, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পতিতাবৃত্তি, নারীব্যবসা প্রভৃতি বিষয় তাঁর গল্পগুলোতে রূপায়িত হয়েছে।

'পথ জানা নাই' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটময় পরিস্থিতির জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র ফুটে উঠেছে। 'মাউলতলা' নামে বহির্জগতের সাথে সম্পর্কবিহীন প্রান্তবর্তী একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে এ গল্পের আখ্যান পরিকল্পিত। নানা রাজশক্তির উত্থান-পতন, বণিকসভ্যতার স্পর্শ, ইংরেজ শাসনের দৌরাত্ম্য কোনো কিছুই মাউলতলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু শহরের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী একটি সড়ক মাউলতলার মানুষদের জীবনে নিয়ে এসেছিল আকস্মিক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। মাউলতলার মানুষ ভেবেছিল এ সড়ক তাদের যুক্ত করবে সম্ভাবনার সোনালি আলোয় ভরা শহরের সঙ্গে, তাদের জীবনের অপূর্ণতাগুলোকে ভরে দেবে পূর্ণতার সম্ভারে। তবে দরিদ্র কৃষক গহুরালীর মতোই মাউলতলার মানুষগুলো অনেক মূল্য দিয়ে বুঝলো যে পথ সবসময় সৌভাগ্য আর সমৃদ্ধিকেই নিমন্ত্রণ করে আনে না। কোনো কোনো পথ একই সঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডেকে আনে দুর্ভাগ্য আর দুরাশাকেও। সড়কটি নির্মাণের ফলে গ্রামের অভাবগ্রস্ত মানুষগুলো শহরে কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পায় ঠিকই, তবে একই সঙ্গে শহরের কুটিলতা আর কূটকৌশলও গ্রামে প্রবেশ করে; বদলে দেয় মাউলতলাবাসীর সহজ-সরল জীবনকে—"এই পথে শহরের ফৌজদারী দেওয়ানিতেও ছুটোছুটি শুরু হইল ধীরে ধীরে। শাদামাটা সরল জীবনে আসিতে লাগিলো কূটবুদ্ধি আর

কৌশলের দড়িজাল" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ১৭৩)। ক্রমেই মাউলতলার জীবন হয়ে ওঠে জটিল, শঙ্কাগ্রস্ত। শুরু হয় দলাদলি, হানাহানি; ঘটে যায় খুনের মতো ঘটনা। তাই রাস্তার প্রধান উদ্যোক্তা জোনাবালী গ্রামের মানুষদের ভর্ৎসনা করে—'সড়ক কি এয়ার লাইগা বানাইছিলাম আমরা? আকাট মুর্খ জানোয়ারের দল!'। এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে আক্রান্ত হয় নির্জন গ্রাম মাউলতলাও। দুইশত বছরের ইংরেজ শাসনেও যা ঘটেনি এবার তাই ঘটল এ অঞ্চলে :

> চাল-ডালের দাম বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের। কমিল কেবল জীবনের। ধীরে ধীরে এ সড়ক বহিয়াই আসিল মন্বন্তর, আসিল রোগব্যাধি, চোরাবাজার আর দুর্নীতির উত্তাল জোয়ার। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ১৭৪)

এই জোয়ারে শহর থেকে আসতে থাকে দুর্নীতিবাজ নানা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, মিলিটারির দালাল। শহর থেকে আসতে থাকা এসব মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে গ্রামের মানুষদের। যার পরিণামে শহরের সাহেবের বাবুর্চিখানায় কাজ করে যে লুৎফর, তার সাথে আজগরউল্লাহর কন্যা কুলসুম উধাও হয়ে যায়; লড়াই-ফেরত ইউসুফের স্ত্রী কঠিন স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ঘটনাচক্রে গহুরালীর স্ত্রী হাজেরাও একদিন উধাও হয়ে যায় মিলিটারির দালালের সঙ্গে। রাগে দুঃখে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে গহুরালী। নতুন রাস্তাটিকেই তার এবং গ্রামবাসীর জীবনের সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবে ধরে নিয়ে কোদাল দিয়ে রাস্তাটিকে কোপাতে থাকে সে। সেই সঙ্গে স্বগতোক্তি করতে থাকে—"ভুল অইছিলো এই রাস্তা বানাইয়া। আমরা যে রাস্তা চাইছেলাম হেয়া এ না; ঠিক অয় নাই।" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৩ : ১৭৬)

'শেষ প্রহর' গল্পে মন্বন্তরের প্রভাবে দরিদ্র গ্রামবাসী সর্বগ্রাসী অভাবের তাড়নায় দিশেহারা হয়ে ওঠে। ঘরে সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষিত হবার পর সবাই ধার-কর্জ করে ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে। কিন্তু চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে দ্রুতই নাগালের বাইরে চলে যায়। এ পরিস্থিতিতে হোসেনের মত দরিদ্র মানুষেরা শেষ চেষ্টা হিসেবে চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে অস্তিত্বরক্ষার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। 'অনেক দিনের আশা' গল্পে দেখা যায় আয়নদ্দির মতো সাধারণ গ্রামবাসীর জীবনে কী ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তেতাল্লিশের মন্বন্তর। একসময় আয়নদ্দির আত্মীয়-পরিজন সহায়-সম্বল সবই ছিলো। কিন্তু 'আকালের বছর অভাব আর মহামারীর ঝাপটে' আয়নদ্দি সবই হারালো। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রবল বাসনায় নিরুপায় আয়নদ্দি এক পর্যায়ে চৌর্যবৃত্তিকে বেছে নেয় পেশা হিসেবে। মন্বন্তর এবং তৎপরবর্তী অভাব-দারিদ্র্য কেবল মানুষের মুখের আহারই কেড়ে নেয় না; কেড়ে নেয় মূল্যবোধ আর নীতি নৈতিকতাকেও—যা ধনী-দরিদ্র সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ধনীরা যেমন মন্বন্তরের সুযোগে নিজের আখের আরো ভালোভাবে গুছিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা করে, দরিদ্ররাও তেমনি সর্বস্ব হারিয়ে যেনতেনভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এক মরণপণ সংগ্রামে মেতে ওঠে। মন্বন্তরের প্রভাবে তরুণ মনের স্বপ্নসাধ কীভাবে ভেঙে গুড়িয়ে যায় তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'হঠাৎ' গল্পে। সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী কিশোর রত্তনের হৃদয়ে ঝড় তোলে কুলসুম নামের এক অপরিচিত কিশোরী। দুজনের মধ্যে দ্রুতই গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা। কুলসুমকে নিয়ে নানারকম স্বপ্ন-কল্পনার জাল বোনে দরিদ্র কৃষকের সন্তান রত্তন। এরই মধ্যে তার পিতা এলালদ্দি সুন্দরবন থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করার একটি কাজ ঠিক করে রত্তনের জন্য। চল্লিশ টাকা মাস মাইনের আকর্ষণীয় এই কাজের খবর রত্তনের দরিদ্র পিতামাতার মনে আনন্দের ঢেউ তুললেও কুলসুমকে হারানোর আশঙ্কায় রত্তনের মন বিষাদে ছেয়ে যায়। তার মনে হয়—'চারিদিকে তার স্বপ্নসাধ চুরমার করে দেবার জন্য কী এক ষড়যন্ত্র তৈরী হয়েছে, মনের কোনো সুকুমার কামনা বাসনার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না তারা।' খালের পাড়ে সৌন্দর্যের পসরা সাজানো পলাশ আর মাদারের রঙ তার মনকে

কুলসুমের জন্য আকুল করে তুললেও পরিবারের কথা চিন্তা করে নিজের মনকে শক্ত করার চেষ্টা করে রত্তন :

> কিন্তু না। তার কথা ভাববে না আর। এই আকাল ছিন্নভিন্ন করেছে সংসার, কেড়ে নিয়ে গেছে আত্মীয়স্বজন, দুঃখ-কষ্টে ভরে তুলে দুর্বিসহ করেছে জীবন, এমন কী হৃদয়ো তার চাপে চুরমার! এদিনে না মূল্য আছে জীবনের, না ভালোবাসার। (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ৮৩)

'জীবনের শুভ অর্থ' গল্পে দেখা যায় মন্বন্তরের কারণে গ্রাম থেকে দারিদ্র্যপীড়িত অসংখ্য মানুষ ভিড় করেছে শহরের রাস্তায়-অলিতে-গলিতে। ক্ষুধা-অনাহারে পর্যুদস্ত এসব মানুষের কাছে মনে হয়, শহরেই আছে তাদের ক্ষুধা-নিবারণের নিশ্চয়তা। কিন্তু সেখানেও তাদের অতিবাহিত করতে হয় মানবেতর জীবন, পড়তে হয় তীব্র অস্তিত্ব সংকটে। অন্যদিকে অনাহারে ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষপীড়িত এসব মানুষ নাগরিক জীবনে কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে–এমন আশঙ্কায় ভুগতে থাকে শহরের মানুষ। এরকমই একজন ব্যক্তি লোকনাথ দত্ত। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান লোকনাথ দত্ত এখন বিপুল বৈভবের মালিক। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা বুভুক্ষু মানুষের স্রোত তাকে বিচলিত করে তোলে। লেখকের বর্ণনায় :

> অম্বিকা চৌধুরীর বাড়ির সামনে ঐ ভয়ানক ভিখিরিদের কী বিতরণ করা হচ্ছে? ফুটপাতের ওপর অমন লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে কোন অমৃতের প্রতীক্ষা করছে ওরা? যেদিকে তাকান–ফুটপাথে, আইল্যান্ডে, দরজাবন্ধ বাড়ীর রোয়াকে রোয়াকে ঐ অদ্ভুত বুভুক্ষু জনতা কোন ফাঁকে পঙ্গপালের মতো এই শহরকে ছেয়ে ফেললো, ভেবে কী এক ভয় তাঁকে বিষন্ন করে আনলো। (শামসুদ্দীন, ১৯৫৩ : ৪৯)

তেতাল্লিশের মন্বন্তরের বিপুল বিস্তৃত থাবা গ্রামের সাধারণ মানুষের সহজ-সরল জীবনযাত্রাকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে তার আরেক বাস্তবতা প্রতিভাত হয়েছে 'বজ্র' গল্পে। কর্মসংস্থানের খোঁজে গ্রামের বাস্তুহারা নিরন্ন মানুষ আশ্রয় নেয় শহরের ফুটপাথে। জীবনধারণের অনিবার্য তাগিদে গ্রামের কৃষক হয় শ্রমিক, অর্থের প্রয়োজনে চাকুরিসূত্রে গ্রাম থেকে ছুটে আসা অসহায় অস্তিত্বহীন মানুষ নীতিভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়, বেছে নেয় পতিতাবৃত্তির মত গ্লানিকর জীবন। এ গল্পের সহজসরল পল্লিবালিকা ফুলিও পতিতাবৃত্তির মতো নির্মম জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয় জীবনের তাগিদে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনোয়ার ক্ষণিকের শরীরী আনন্দে নিঃস্ব হৃদয়ের জ্বালা জুড়ানোর জন্য দেহপসারিণীর গৃহে রাত্রিযাপন করে। কিন্তু অচিরেই আবিষ্কার করে এই নারী আর কেউ নয়, তারই আদরের ছোটবোন ফুলি। নিয়তির এই নিষ্ঠুর পরিহাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে আনোয়ার।

মন্বন্তর ও তৎপরবর্তী সময়ের নানা অরাজকতা ও নীতিহীনতার অন্যতম উদাহরণ নারীব্যবসা। 'কলাবতী' গল্পের নামচরিত্র কলাবতীর জীবনের করুণ পরিণতি সমাজে নারীর অসম্মানজনক অবস্থানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মুসলিম যুবক মজিদের সাথে কলাবতীর প্রেমকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, এর পরিণতিতে প্রেমিক মজিদের মৃত্যু এবং সেই অপরাধে কলাবতীর পিতা সুরেন দাসের জেলদণ্ড, সামন্তপ্রভু বৃন্দাবন চক্রবর্তীর ষড়যন্ত্রে কলাবতীর পরিবারের একঘরে হওয়াসহ নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলাবতীর জীবনে একের পর এক দুর্দশা দেখা দিতে থাকে। অভাব-অনটনে জর্জরিত, সমাজের চোখে নিগৃহীত এবং দুর্ভাগ্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত কলাবতীর জীবনে শেষ আঘাতটি আসে তাদের পরিবারের ছদ্ম-শুভাকাঙ্ক্ষী মহিমের মাধ্যমে। মিলিটারির কনট্রাক্টর এক পাঞ্জাবি শিখের রাঁধুনি হিসেবে চাকুরি জুটিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে কলাবতীকে নিয়ে যায় মহিম। পরিশেষে অর্থের বিনিময়ে কলাবতীকে তুলে দেয় নারী পাচারকারী চক্রের হাতে।

পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও বিবাদ-বিসংবাদ

পল্লিবাংলার মানুষের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের চেয়ে পারস্পরিক প্রীতিময় সম্পর্কই বেশি চোখে পড়ে। যন্ত্রসভ্যতায় অভ্যস্ত শহরবাসীর তুলনায় এখানেই তারা ব্যতিক্রমী। বিপদে পড়লে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না। 'শেষপ্রহর' (*শাহেরবানু*) গল্পের হাজী সাহেব এমনই একজন মানুষ যাঁর সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পের দরিদ্র-অসহায় কৃষক হোসেনের প্রতি তার সহানুভূতিশীল আচরণের মাধ্যমে। হোসেনের জীবনের নানা দুর্যোগে হাজী সাহেব ছিলেন তার পরম আশ্রয়। আর তাই হোসেনের কাছে তিনি ছিলেন 'খোদারই মূর্তিমান স্নেহাশীষের মতো'। 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ কাসেম খাঁ আর তার 'মুনিষ' সাদেকের মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, যা মালিক ও শ্রমিকের প্রথাগত সম্পর্কের পরিধি ছাড়িয়ে এক মহত্তর পরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ হয়। গল্পে দেখা যায়, সাদেকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠে-বাগানে কাজ করে গৃহস্থ কাসেম খাঁ। আবার কাসেম খাঁর প্রতিনিধি হয়ে একাই ভাটি অঞ্চলে চলে যায় সাদেক, সেখানকার জমি মুনিষদের হাতে বন্দোবস্ত দেয়ার ভারও বর্তায় সাদেকের ওপর। এক পর্যায়ে সাদেক গুটিবসন্তে আক্রান্ত হলে কাসেম খাঁ তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে এবং পরিবারের একজন সদস্যের মতই সেবাশুশ্রূষা করতে থাকে। গ্রামের লোকজন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত সাদেকের সাথে কাসেম খাঁর এই ঘনিষ্ঠতায় আপত্তি জানিয়ে তাকে 'গুটিঘরে' রেখে আসতে বলে। কিন্তু সাদেকের এই অবস্থায় তাকে দূরে সরিয়ে দেয়নি কাসেম খাঁ। দারিদ্র্যের নিষ্পেশনে জীবন অতিষ্ঠ হলেও বিপদে-আপদে পাড়া প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্বজনের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা গ্রামবাংলার মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত আহার্য যেমন প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, আবার অনেক সময় নিজেদের দু-মুঠো অন্নের সংস্থান না হলেও প্রতিবেশীদের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শনে পিছিয়ে থাকে না এসব মানুষ। *মজা গাঙের গান* গল্পগ্রন্থের নামগল্পে দরিদ্র বৃদ্ধা বরুজান ও তার প্রতিবেশী ছদু শেখের পরিবারের মধ্যে এমনই সৌহার্দ্যময় সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়। মজা গাঙের গান থেকে সামান্য কিছু মাছ ধরে সেখান থেকে প্রতিবেশিনী বরুজানকেও কয়েকটি মাছ উপহার দেন ছদু শেখ। আবার বরুজানও ছদু শেখ ও তার স্ত্রীকে সাধ্যমত আপ্যায়নের চেষ্টা করে।

তবে পরস্পরের সঙ্গে প্রীতিময় সম্পর্কের পাশাপাশি অনেক সময় অহেতুক দ্বন্দ্বেও জড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসী। জমির ভাগ-বাটোয়ারা কিংবা পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ গ্রামীণ সমাজের এক চিরপরিচিত চিত্র। এই বিবাদ-বিসম্বাদ কখনো ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, আবার কখনো বা এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও জেদের কারণে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক সময় বংশপরম্পরায় চলতে থাকে এটি। 'কালীদহের তীরে' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে কালীদহের খালের দুই পাশে দুই গ্রাম–পূবকান্দা ও পাঁচআনি। এ দুই গ্রামের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে তীব্র বিবাদ। দুই গ্রামের দুই মাতবর আসগর ও করিমের পিতামহেরা ছিলেন জমিদারের লাঠিয়াল। দুই লাঠিয়াল সর্দারের পারস্পরিক বিরোধ থেকে দুই গ্রামের মানুষের দীর্ঘস্থায়ী মতবিরোধের শুরু, যা এখনও বর্তমান। সেই বিবাদ এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে—

> [...] এ গাঁয়ের লোক ও-গাঁয়ের পথে হাঁটে না। হাটে বা গঞ্জে পারতপক্ষে সামনাসামনি পড়ে না। যায় না একই নদীতে ইলিশ মাছের দিনে। হাটে বা গঞ্জে এ-গাঁয়ের লোক কোনো জিনিসের দর আট আনা করলে ও-গাঁয়ের লোক তা ডবল দামে কিনে নাকের সামনে দিয়ে উঁচিয়ে নিয়ে যায়। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ৮৮)

স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কৈলাস সাহার চেষ্টায় দুই গ্রামের বিবাদ ক্রমশ থিতিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে সেটি গুরুতর রূপ ধারণ করে। এরই মধ্যে আসগর সর্দারের গরু করিম সর্দারের ক্ষেতের ধান খেয়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার

ঝামেলার সূত্রপাত হয়। দ্রুতই সেটি দুই গ্রামের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয়। লেখকের বর্ণনায় :

> [...] দুই চোখে আগুন জ্বেলে অজগরের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে আহত গোরুসহ বাড়ীর দিকে ছুটে চলে গেলো আসগর। ঘরের বারান্দার আড়া থেকে লেজা-ঢাল নামিয়ে উঠোনে লাফিয়ে পড়লো। তারপর নুয়ে মাটির দিকে চেয়ে ডান হাত মুখের কাছে দ্রুত কাঁপিয়ে আ-আ করে একদমে এক প্রচণ্ড ডাক তুলে, ধনুকের ছিলার মতো ছিটকে খাড়া হয়ে জেলাবোর্ডের পথের দিকে ছুটে গেল। সে ডাক শুনে থরথর করে কেঁপে উঠলো মধ্যাহ্নের পাঁচআনি। জোয়ান পুরুষেরা উদ্যত কানে দিক-নিশানা করে হাতের কাছে লেজা-সড়কী যে যা পেলো তাই নিয়ে ছুটে বেরুলো। অনেকদিন পরে ষাট সত্তর জোড়া পায়ের তলায় জেলাবোর্ডের পথের ধুলো উড়লো। পাঁচআনির বাল-বনিতা ঝি-বউদের রক্তস্রোত হিম হয়ে এলো তাদের আকাশ-ফাটানো গাজী-গাজী ধ্বনিতে নিষ্কম্প ভয়ে। (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ৮৫)

দুর্ভাগ্যক্রমে কৈলাস সাহা বাড়িতে না থাকায় এবার আর এই বিবাদ থামানোর কেউ ছিল না। জেলা বোর্ডের সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে প্রথমে চললো গালিগালাজের তুবড়ি, তারপরই শুরু হয়ে গেল পুরোদস্তুর 'যুদ্ধ'; যার পরিণতিতে করিম সর্দারের ছেলে 'স্বাস্থ্যসবল সুদর্শন নওজোয়ান' ছেলে জামাল আহত হয় এবং তার করুণ মৃত্যু ঘটে।

ভূসম্পত্তির অধিকার নিয়েই গ্রামের অধিকাংশ বিবাদের সূচনা হয়, যার রেশ থেকে যায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। 'বাঁদর' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কেরামত আলী ও প্রতিবেশী সিকান্দরও বংশানুক্রমিক শত্রুতায় আক্রান্ত, যার উৎস জায়গা-জমি নিয়ে বিবাদ। 'তারা গত হবার পর ঘটনা আর গড়ায়নি, কিন্তু উভয়পক্ষ থেকেই কথা বন্ধ, বন্ধ সামাজিকতাও।' এক পর্যায়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। কেরামত আলীর নববিবাহিত বধূর প্রতি কুনজর পড়ে সিকান্দরের। এজন্য কৌশল হিসেবে কেরামতের মন জয়ের চেষ্টা করে সে, আর টোপ হিসেবে ব্যবহার করে জমিজমাকে। অবার গ্রামীণ সমাজে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুটো শ্রেণির মধ্যেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতও পরিলক্ষিত হয়। 'মৌসুম' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের প্রতিনিধি জমিদার দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরীর সাথে গ্রামের উঠতি মাতবর সখানাথ ও তার পুত্র রমানাথের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে বিরাজমান শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। রমানাথ ও তার পিতা জমিদারির জোয়াল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করে সাধারণ মানুষকে, আর এ থেকেই জমিদার দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরীর সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে তাদের। জমিদারশ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার বিপুল পার্থক্য ধরা পড়ে সখানাথের নিম্নোক্ত খেদোক্তিতে :

> তারা যে চাষা এটা তো নোতুন কথা নয়। ওরা জমিদার, ওদের সুখদুঃখ হাসি-কান্নার সাথে তাদের আসমান-জমিন ফারাক। ওরা এক জাত তারা অন্য। তাদের সর্বনাশেই তো ওদের পৌষমাস। এই তো রীতি। (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ১৪১)

সাধারণ মানুষের শ্রমে-ঘামেই রচিত হয় শাসকদের ক্ষমতার ভিত্তি। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে এই সাধারণ মানুষকে শোষণ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না তারা; তাদের চোখে এসব মানুষ কেবল ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়িমাত্র। আর এ কারণেই, ক্ষমতাবানদের দাসত্ববৃত্তিই হয়ে দাঁড়ায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষগুলোর একমাত্র কাজ।

গ্রামীণ লোকাচার ও সংস্কার

শহরের তুলনায় গ্রামের সমাজ-সংস্কৃতি এবং লোকাচার ভিন্ন রকম। বিশেষ করে উৎসবে পার্বণে শহরের মানুষের উদযাপনের সঙ্গে গ্রামের মানুষের উদযাপনের মাত্রা এবং প্রকৃতিগত

পার্থক্য রয়েছে। আবার গ্রামাঞ্চলেও লোকাচারের ভিন্নতা রয়েছে যা প্রকৃতি ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। গবেষকের ভাষায়—

> মানব-সংস্কৃতির যে-কোনো অংশের মত, লোকসংস্কারও ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক প্রভাবের আওতায় পড়ে। সমতলভূমিতে যে লোকসংস্কার গড়ে ওঠে, পাহাড়ী অঞ্চলে তা অচল। উপজাতিসমূহের মধ্যেও লোকসংস্কার ভিন্ন ভিন্ন হয়। [...] কিন্তু অনেক সময় এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের, বা এক প্রদেশের মানুষ অন্য প্রদেশের, এমনকি এক মহাদেশের মানুষ অন্য মহাদেশের লোকসংস্কারকে গ্রহণ করে এবং তা নিজেদের মত করে পরিবর্তিত করে নেয়। (আবদুল, ১৯৭৫ : ৭০)

পল্লি জনগোষ্ঠীর লোকাচারের মধ্যে এক ধরনের সহজাত সৌন্দর্য আছে, এতে নেই আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি। পল্লি প্রকৃতি যেমন উদার ও উন্মুক্ত, পল্লিবাসীর জীবানাচারও তেমনি উদার। সময়প্রবাহে তাতে কৃত্রিমতার ছোঁয়া লাগলেও গ্রামীণ লোকাচারের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো এখনও প্রায় অটুটই আছে। বাংলাদেশে স্থানভেদে লোকাচারের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবই লক্ষণীয়। 'এই ভূখণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের জাতিগোষ্ঠীর লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে নানা প্রথা-পার্বণ, আচার-উৎসব গড়ে উঠেছে' (ওয়াকিল, ২০০৭ : ৩১৭)। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রাচুর্য না থাকলেও ছিল স্বস্তি, আর ছিল অফুরন্ত অবসর। অবসর জীবনে বিনোদনের উপাদান হিসেবে নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা যাত্রাপালা-পাঁচালি, কথকতা-গান আর নাচের উৎসবের আয়োজন হতো। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে যেসব লোকাচারের প্রচলন দেখা যায় সেগুলো সাধারণত গ্রামীণ মানুষদের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকাকেন্দ্রিক। যেমন : মানুষের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, ধর্মীয় আচার, রোগ-ব্যাধি এবং পেশা সংক্রান্ত নানাপ্রকার লোকাচার। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গল্পেও গ্রামীণ লোকাচারের নানা অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে।

নবান্নের সময় গ্রামের প্রতিটি ঘরে ধানকাটা, ধান মাড়াইসহ নানারকম কাজের ব্যস্ততা শুরু হয়। অনেক সময় রাতভর কাজ করে মানুষ। সারাদিন মাঠ থেকে ধান কেটে এনে সন্ধ্যার পর গৃহস্থ, মুনিষ, ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই মিলে বাড়ির উঠোনে কাজ করে। তাদের টানা কাজের ক্লান্তি কিছুটা দূর হয় কারো মুখে পালা-পুঁথি গান বা গল্প শুনে। অনাবিল আনন্দ নিয়ে তারা সবাই মিলে কাজ করে। 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে এরকমই এক আনন্দমুখর নবান্ন উৎসবের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'মুনিষ'দের সাথে নিয়ে বাড়ির মানুষদের রাতভর ধান মাড়ানো, সেই সাথে আড্ডা ও খোশগল্পের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় এ গল্পে। একপাশে পানের বাটা নিয়ে বসেছে বাড়ির মেয়েরা, সেখান থেকে পান আসছে কর্মরত মানুষগুলোর কাছে। এভাবেই নবান্নের উৎসবমুখর পরিবেশ জীবন্ত হয়ে ওঠে লেখকের বর্ণনায়।

বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির অনেক উপাদানই প্রকৃতিজাত বা প্রকৃতিনির্ভর। বছরভর প্রকৃতির অঙ্গনে ঘটে চলা নানা পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে নানা প্রথা আর রীতিনীতি অনুসরণ করতে দেখা যায় গ্রামবাসীদের। 'বস্তুত লোকাচারগুলি হলো এ দেশবাসীর আজন্মলব্ধ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের অঙ্গ। মানবজীবন নানা আশঙ্কা ও ভীতি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তা ইত্যাদি অভিব্যক্তির মধ্যে আবর্তিত হয়। এর সঙ্গে রয়েছে দৈবশক্তির সহাবস্থান (ওয়াকিল, ২০০০ : ৩১৭)।' দরিদ্র, অসহায়, নিরক্ষর মানুষরা তাদের জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিজনিত ভয় ও শঙ্কা থেকে লৌকিক, অলৌকিক, নৈসর্গিক শক্তিসমূহকে সমীহ ও তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কৃষিপ্রধান বাংলার মাটি উর্বর ও কৃষির উপযোগী হলেও কখনো কখনো প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির কারণে চাষাবাদ ও ফসলের ক্ষতি সাধিত হয়। এরকম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের আশায় মানুষের দৈবিক বিশ্বাস ও

বৈষয়িক কল্যাণ কামনা থেকেই নানা আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব। 'অনেক দিনের আশা' গল্পগ্রন্থের 'মৌসুম' গল্পে টানা অনাবৃষ্টির কারণে ফসলহানির আশঙ্কা থেকে বৃষ্টির জন্য নানা রীতি-রেওয়াজ পালন করে গ্রামের কৃষকরা। লেখকের বর্ণনায় :

> শুরু হয় জলের জন্য কতো রকম কান্নাকাটি। ধূমধাম ক'রে এই সেদিন নীলপূজো করেছে, এবার মানে পীরের দরগায় সিন্নি, জনে জনে মানত করে, বাড়ি বাড়ি কীর্তন দেয়, এমনকি মৌলবী ডেকে দল বেঁধে শুকনো ক্ষেতে নেমে মিলাদও পড়ে। (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ১৩৮-১৩৯)

অনাবৃষ্টির সময় যেমন, তেমনি আবার আকস্মিক নানা বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে মিলাদ পড়ানো, দরগায় সিন্নি দেওয়া ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান পালন করে গ্রামের মানুষ। 'মূলধন' (*শাহেরবানু*) গল্পের দরিদ্র কৃষক মেনাজের জীবনের বেঁচে থাকার অবলম্বন 'মনু' নামের একটি গরু। হঠাৎ গ্রামে মহামারী আকারে দেখা দেয় গো-মড়ক। এ অবস্থায় সন্তানতুল্য মনুকে হারানোর শঙ্কায় মেনাজ পাগলপ্রায়। মনুর কল্যাণ কামনায় তাই মেনাজ মিলাদের আয়োজন করে।

পল্লিবাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা শহরের তুলনায় অনেক নাজুক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামের সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, যা গ্রামের স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে আরো সঙ্গীন করে তুলেছে। গ্রামের মানুষ আবহমানকাল ধরেই ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ ইত্যাদি লৌকিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় আস্থাশীল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পল্লি অঞ্চলের মানুষ এসব চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল। 'লোক-চিকিৎসার মূলে আছে অজ্ঞানতা-প্রসূত নানা প্রকার লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কার' (ওয়াকিল, ২০০০ : ১৬৯)। 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে গুটিবসন্তের কারণে গ্রামীণ জীবনে সৃষ্ট আশঙ্কা ও অস্থিরতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষিশ্রমিক সাদেকের গায়ে 'বসন্তের স্ফোটক' দেখা দিলে তার নিয়োগকর্তা কাসেম খাঁ সহানুভূতিপরায়ণ হয়ে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু বসন্তের রোগীর প্রতি কাসেম খাঁর এই আন্তরিক আচরণ গ্রামের মানুষের ক্ষোভ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিণতিতে—

> কাসেমের বাড়ীতে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেলো। হিতৈষীরা দূর থেকে উপদেশ ছুঁড়তে লাগলেন–ও রোগ বড়ো সাংঘাতিক, কাসেম খাঁ! ওরে সরাও, নইলে গ্রাম উজাড় অইয়া যাইবে। কেউ কেউ বললেন–তুমি যা হয় একটা কিছু করো, নইলে পুলিশে খবর দিমু–গুটিঘরে লইয়া যাও।[২] (শামসুদ্দীন, ১৯৪৫ : ৬৪-৬৫)

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও অসচেতনতার কারণে অসুস্থ একজন মানুষের সেবা-শুশ্রূষা তো দূরের কথা, বরং সমাজের কাছে সে অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হয় যা তাকে মানসিকভাবে আরো দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া গুটিঘরে নেয়ার যে প্রক্রিয়া সেটিও অত্যন্ত অমানবিক, যা রোগীর রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে তাকে আরো শোচনীয় অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়।

নগরসভ্যতার প্রভাব

গ্রামনির্ভর বাংলার সমাজজীবনে নগরসভ্যতার প্রভাব ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সুবাদে নাগরিক জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য যেমন গ্রামজীবনে প্রবেশ করেছে, তেমনি নগরের আকর্ষণে গ্রামত্যাগের একটি প্রবণতাও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কাজের খোঁজে কিংবা মন্বন্তর ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও গ্রামের মানুষ বিপুল সংখ্যায় শহরমুখী হয়েছে। তবে শহর যে সবসময়ই তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত স্বস্তি এনে দিতে পেরেছে তা বলা যাবে না। শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে গ্রাম ও শহরের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নানাভাবে ধরা পড়েছে।

ক্রমবিকাশমান নগরসভ্যতার প্রভাবে গ্রামের নিস্তরঙ্গ শান্তিময় জীবন নানা নেতিবাচকভাবে প্রভাবের শিকার হওয়ার বিষয়টিকেই মূলত গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক। মন্বন্তরের প্রভাবে গ্রামে অন্নাভাব দেখা দিলে পরিবার পরিজন নিয়ে নিরুপায় হয়ে শহরে ছুটে যায় গ্রামের মানুষ। সেখানকার লঙ্গরখানাগুলোই তখন হয়ে দাঁড়ায় তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। এভাবে সাময়িক ক্ষুধানিবৃত্তি ঘটলেও শহরে স্থায়ীভাবে মাথা গোঁজার সুযোগ অনেকেরই কপালে জোটে না। বাধ্য হয়ে ফের গ্রামের দিকেই যাত্রা করতে হয় তাদের। সেখানে এসে পুনরায় আগের জীবনে ফিরে যাওয়া অনেকের জন্যই হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য, যা কারো কারো জীবনে মর্মান্তিক পরিণতিও ঘটায়। 'ক্ষুধা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের আমেনা দুর্ভিক্ষের সময় সপরিবারে শহরে চলে যায়। সেখানে তার স্বামী ও পুত্র দুজনেরই মৃত্যু ঘটে বসন্তরোগে। সর্বস্ব হারিয়ে হতাশ, বিষণ্ন আমেনা ফিরে আসে গ্রামে। ভেবেছিল আগের মতই ধান ভেনে, ঝরা-ধান কুড়িয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করবে। কিন্তু দেখা গেল, নগরসভ্যতার প্রভাবে এখানেও তার জন্য হতাশাজনক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিকাজে যান্ত্রিক উপকরণের ব্যবহারের কারণে এখন আর আমেনার মতো কৃষিশ্রমিকদের কোনো চাহিদা নেই। গল্পের একটি বর্ণনাংশ :

> কিন্তু যে বাড়িতে বরাবর ধান ভানিত, সেখানে গিয়া শুনিল যে তাহারা যতোটা সম্ভব নিজেরা এবং বাকিটা ঝালকাটির কলে ভানাইতেছে, সুতরাং এবারে তাহাদের কোনো লোকের প্রয়োজন নাই। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ১১০)

একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল 'পৌষস্বপ্ন' গল্পের মকুও। সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় স্বামী-সন্তান নিয়ে শহরে গিয়েছিল সে। সেখানে গিয়ে অকালে স্বামীকে হারিয়ে গ্রামে এসে সে দেখল, যন্ত্রের দাপটে তার চেনা জীবিকাই এখন হুমকির সম্মুখীন। যেখানে সে ধান ভানত সেই সর্দারবাড়ির বড়োবউয়ের ভাষ্যে পরিবর্তিত সময়েরই চিত্র ফুটে উঠেছে —'আমাদের সব ধান এবার কলে ভানাচ্ছে। [...] তাতে খরচা অনেক কম পড়ে। ধান ভানার জন্য এবার আর কাউকে রাখবোনা।' (শামসুদ্‌দীন, ১৯৪৫ : ২৮)

পুঁই ডালিমের কাব্য গল্পগ্রন্থের 'লালবাত্তি' ও 'কায়-কারবার' শীর্ষক দুটি গল্পে পল্লি জীবনে নগরায়নের প্রভাবে গ্রামীণ জীবনের বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'কায়-কারবার' গল্পে আজাহার মল্লিক নামে এক চড়নদার গ্রামে আসে হোগলা ও ছন কিনে শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তার এই প্রস্তাবে অধিকাংশ গ্রামবাসীই মনঃক্ষুণ্ন হয়। তাদের কেউ কেউ এটি নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ে না। আইনদ্দি নামে এক গ্রামবাসীর তির্যক মন্তব্য—'মাছ গেছে, সাপ গেছে, গেছে ব্যাঙ বান্দর, এইবার ঘাস ধরিয়াও টান পড়ছে। কেন, ঐ শহর-বন্দরের মানুষে এখন বুঝি ঘাসও খাইতে শুরু করছে?' শহরবাসীর বাণিজ্যিক লালসার কারণে গ্রামের চিরায়ত ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তাড়া করে কাউকে কাউকে। ধনু নামে এক বয়োবৃদ্ধের উক্তিতে এই আশঙ্কা প্রতিফলিত হয় :

> দেশ হইতে একে একে কলাটা-মুলাটা গেছে, এইটা গেছে সেইটা গেছে, এখন যেটুকু আছে এই দুই মুঠ ঘাস তার বদলায় কী পাওন যাইবে সেইটাও আগে বুঝিয়া লওন দরকার [...] হাটে বাজারে বান্দর সাপ গলুই ব্যাঙ কী মাছের খরিদ্দারদের ভিড় তো লাগিয়াই আছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখেন একটা গাছও চোখে পড়া ভার। কাঠের ব্যাপারিদের যাওয়া-আসা তবু কমে নাই। সেই যুদ্ধের কালে কী সাপ্লাইর নাম করিয়া সব উঠাইয়া লইয়া যাইতে শুরু করছিলো। কিন্তুক কায়-কারবারের বিষয় আমরা তো তেমন বুঝি সুঝিনা, তাই ভালো দামও ভাগ্যে জোটে না। (শামসুদ্‌দীন, ১৩৯৪ : ৬৮)

দারিদ্র্যের প্রকোপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত গ্রামবাসীর কাছে শহর হচ্ছে ইচ্ছেপূরণের এক স্বর্ণালি বন্দর। এ কারণে শহরের জীবন সম্বন্ধে তাদের মনে অনেক অনিশ্চয়তা আর সংশয়

থাকলেও শহর তাদেরকে চুম্বকের মতোই আকৃষ্ট করে। দরিদ্র কৃষক মুজফ্ফর ও তার স্ত্রীর কথোপকথনে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়—

> : মানুষ তো মানুষ। এখন মাটিও দেখি গাঁও গেরাম থেকিয়া উজার হইয়া যাইতে আছে। হুকায় মনের সুখে টান দিতে দিতে মুজফ্ফর বললো: হইবেই তো। শহর জিনিসটা কী কোনো ক্ষুদ্দুর ব্যাপার-স্যাপার। সেই খানেই তো রাজ-রাজত্ব, শরাফতি-উন্নতি। (শামসুদ্দীন, ১৩৯৪ : ৫২)

আবার একই সঙ্গে গ্রাম থেকে শহরমুখী এই অন্তহীন স্রোতের পরিণতি নিয়েও আশঙ্কায় ভোগে তারা, যা মুজফ্ফরের স্ত্রীর উক্তিতে পরিস্ফুট হয়—

> ছোটকালে তো খাল ঝিলের মাছের উপর মালিকানার কথা শুনি নাই। এখন তার মাছ যায় শহরে, গাছপালা কাটিয়া কাঠ-লাকড়িও যায় শহরে, আনাজ-তরকারি, ফল, ফলারি তো যায়ই। এখন চতুর্দিক কাটিয়া কুটিয়া সবই ঐ শহরে নিয়া উঠাইলে একদিন মনে কয় ঐ শহর চারদিকে সাগর লইয়া একটি চরের মতোই ভাসিয়া থাকবে। (শামসুদ্দীন, ১৩৯৪ : ৫২)

উপকূল-সন্নিহিত গ্রামীণ জনজীবনের দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতাকে গল্পকারের নির্মোহতা ও স্বাপ্নিকের আবেগ দিয়ে বর্ণনা করেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধমান প্রান্তবাসী মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রাম, সংকট ও সম্ভাবনার ছবি এঁকেছেন ছোটগল্পের ক্যানভাসে। এ জীবন কাছ থেকে দেখা তাঁর, এ মানুষগুলো তাঁর পরমাত্মীয়। প্রকৃতির ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে কঠোর পরিশ্রমে তারা বসতি গেড়েছে এ অঞ্চলে। একদিকে ঝড় ও বন্যা, খরা ও নদীভাঙন—এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তারা টিকে আছে। অন্যদিকে ক্ষমতা ও সম্পদলোভী সমাজপতিদের দৌরাত্ম্যে তারা বিপর্যস্ত, কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে এ মানুষগুলোই ফুঁসে ওঠে, সর্বশক্তিতে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। শামসুদ্দীন আবুল কালাম এঁদেরই গল্প বলেছেন শিল্পিত মমতায়। তাদের জীবনের কোনো অনুষঙ্গই তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে বাদ যায়নি। মূলত গ্রামীণ জীবনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-লোকসংস্কৃতিজাত বহুমাত্রিক পরিচয় রূপায়িত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের শিল্পিত ক্যানভাসে।

টীকা

১. Commonwealth War Graves Commission Annual Report 2013-2014. Archived 4 November 2015 at the Wayback Machine.,

২. সূত্র: https://issuu.com/wargravescommission/docs/cwgc_annual_report_ 2013-14_lr_final

সহায়কপঞ্জি

আকিমুন রহমান (১৯৯৩)। *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ* (১৯২০-৫০)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল হাফিজ (১৯৭৫)। *লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ*। মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ], ঢাকা।

ভুঁইয়া ইকবাল (সম্পা., ১৯৯৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*। আহমেদ রফিক, 'মানিক-উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনচিত্র', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ (২০০৭)। *লোকসংস্কৃতি (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭)*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

টি. স্কারলেট এপ্সটেইন ও রোজমেরি এ ওয়াটস (সম্পা., ১৯৮১)। *দ্য এন্ডলেস ডে : সাম কেস ম্যাটেরিয়ালস অন এশিয়ান রুরাল উইমেন*। পারগামন প্রেস, ইউএসএ, গ্রেট বৃটেন কানাডা

অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্স ও জার্মানি। (বাংলাদেশ অংশের রচয়িতা ঝর্ণা নাথ [মহীবুল আজিজ প্রণীত *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ: ১৯৪৭-১৯৭১*, ২০০২, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা)

রওনক জাহান (১৯৭২)। *পাকিস্তান : ফেইলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন*। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস। (মহিবুল আজিজ প্রণীত *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ: ১৯৪৭-১৯৭১*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯৪৫)। *অনেক দিনের আশা*। ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা।

(১৯৫৫)। *দুই হৃদয়ের তীর*। ঢাকা।

(১৯৫৩)। *পথ জানা নাই*। প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ঢাকা।

(১৩৯৪ বঙ্গাব্দ)। *পুঁই ডালিমের কাব্য*। মুক্তধারা, ঢাকা।

(১৯৮৭)। *মজা গাঙের গান*। মুক্তধারা, ঢাকা।

(১৯৪৫)। *শাহের বানু*। নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা।

স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা., ২০০০)। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা।